https://boierpathshala.blogspot.com

থাকে শুধু অন্ধকার

পর্ব ১

■ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

ছোটবেলার একটা ঘটনা এখনও দগদগে দীপ্রর মনে। তখন ওর কতই বা বয়স, আট কিংবা নয়। কিন্তু সেই বয়সেই ও বুঝে গিয়েছিল,' আমেরিকা' শব্দটার মধ্যে রহস্য আছে। ওদের বাড়ি যে অঞ্চলে সেটা তখনও আধা শহর, আধা গ্রাম। এইসিকের রাস্তায় টেলিফোন বুথ তো ওইদিকে বেগুনক্ষেত। আর একটু এগিয়ে খোলা মাঠের মধ্যে গোরু চরে বেড়ায়। সেই মাঠেরই একদিকে ছাতিম গাছের নীচে একটা শীতের সন্ধ্যায় ও রবিনদাকে শিপ্রাদির গলা টিপে ধরতে দেখেছিল। দৃশ্যটার সামনে এতটাই চমকে গিয়েছিল দীপ্র যে গলা দিয়ে আওয়াজ বেরয়নি ওর। যদিও শীত, তবু সোয়েটারের ভিতরে থাকা শরীরটা ঘামে ভিজে যাচ্ছিল দরদর করে। কিন্তু ও জায়গাটা ছেড়ে যেতেও পারছিল না দুর্নিবার কৌতূহলে। মনে হচ্ছিল, ওর পা দুটো যেন কেউ গেঁথে দিয়েছে মাটির সঙ্গে।

—আমাকে ফাঁকি দিয়ে আমেরিকা পালানোর প্ল্যান করেছিস? রবিনদা প্রায় চিৎকার করে বলল। উত্তরে শিপ্রাদি কী বলল, শুনতে পায়নি দীপ্র। হয়তো বা রবিনদা গলা টিপে ধরে রেখেছিল বলে, শিপ্রাদির গলা দিয়ে আওয়াজ বেরচ্ছিল না।

কিন্তু, শিপ্রাদি কিছু একটা বলেছিল নিশ্চয়ই। নইলে রবিনদা আবার কেন চেঁচিয়ে উঠবে,

—সন্দেহ? আমার সঙ্গে সাড়ে তিন বছর খেয়ে-শুয়ে তারপর তুই সম্বন্ধ দেখাচ্ছিস? দীপ্রর একটু অবাক লেগেছিল কথাগুলো। শিপ্রাদি নিজের বাবা-মা'র সঙ্গে খায় না, শোয় না? রবিনদার সঙ্গে খায়, শোয়?

মাসখানেক বাদে শিপ্রাদির বিয়ের কার্ড বাবাকে পড়ে শোনানোর সময় মা কথায় কথায়, যেই না 'আমেরিকা' শব্দটা উচ্চারণ করেছে, দীপ্রর কান্না আর বাঁধ মানল না।

—কী হল, শিপ্রার বিয়ে হবে, আমরা সবাই আনন্দ করব, তুই কাঁদছিস কেন? বাবা ওকে কোলে তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল।

—কিন্তু শিপ্রাদি বিয়ে করে আমেরিকা চলে গেলে রবিনদার সঙ্গে থাকবে কে, শোবে কে? একা একা খেতে-শুতে রবিনদার কষ্ট হবে, তাই না? তখন যদি রবিনদা আবার গলা টিপে ধরে শিপ্রাদির?

বাবা দীপ্রকে প্রায় কোল থেকে ফেলে দিচ্ছিল কথাটা শুনে। আর দীপ্র মাটিতে নামতেই বাবা-মা দু'জন মিলে ম্যারাথন জেরা শুরু করল ওকে। কেন এইরকম একটা কথা বলল দীপ্র, কীভাবে বলল?

রবিন ঘন কুয়াশার জন্য দীপ্রকে দেখতে না-পেলেও, দীপ্র ঠিকই দেখতে পাচ্ছিল রবিন আর শিপ্রাকে— এই ব্যাপারটাই বিশ্বাস করতে চাইছিল না বাবা। কিন্তু, ঘটেছিল ঠিক এটাই। দীপ্র ওদের দেখতে পাচ্ছিল, ওরা পাচ্ছিল না। হয়তো কুয়াশার একদিক থেকে দেখা যায়, অন্য দিক থেকে যায় না। কিংবা হয়তো অন্য কিছু। দীপ্র জানে না।

বিয়ের ঠিক সাতদিন আগে শিপ্রাদির লাশটা যখন পাওয়া গেল ওই মাঠেরই এক ধারে তখনও কিছুই জানত না দীপ্র। কিন্তু, শিপ্রাদির গলার নলিটা কেউ কেটে দিয়েছে শুনে ভুলেই বলে বসেছিল যে রবিনদার কাছে একটা দুর্দান্ত ছুরি আছে। মার্কেটে রবিনদার মুরগির দোকান। দেশি চিকেন কিংবা ব্রয়লার, নটিতে ধরে বাটাপট কেটে দিতে ওস্তাদ লোকটা। তার কাছে যে চাকু থাকবে তা আর আশ্চর্যের কী? কিন্তু দীপ্রর বলা ওই কথাটা ক্লাসেরই কারও কারও সৌজন্যে ছড়িয়ে যায়। এবং স্থানীয় থানার মেজবাবু, ওর সহপাঠী সৈকতের বাবা, একদিন সন্ধ্যায় ওদের বাড়িতে চা খেতে চলে আসেন। চা খাওয়াটা উপলক্ষ, আসল উদ্দেশ্য ছিল দীপ্রকে জেরা, সেটা বোঝা যায় একটু পরেই। এই কথা সেই কথা, ক্লাসে এখন কোন গ্রামার বই ফলো করছে জিজ্ঞেস করতে করতে তিনি দুম করে জিজ্ঞেস করে বসেন যে রবিনের কাছে ছুরি আছে, সেই বিষয়টা দীপ্র জানল কী করে?

—আমি যে রবিনদার হাতে দেখলাম।

—কী দেখলে? সৈকতের বাবা জিজ্ঞেস করলেন।

—একটা কালো খাপে ঢাকা জিনিস বের করে হাতের চাপ দিল আর সঙ্গে সঙ্গে একটা বড় ছুরি বেরিয়ে এল।

—সেই ছুরিটা দিয়ে কিছু করল তখনই? মনে করে বলো।

—না। শুধু হাওয়ায় উঁচু করে ধরে শিপ্রাদিকে শাসাল।

—কী বলল?

—বলল যে শিপ্রাদি যেন এক্ষুনি আমেরিকা যাওয়ার স্বপ্ন ভুলে যায়। নইলে...

—নইলে?

—নইলে রবিনদার চেয়ে খারাপ কেউ হবে না।

তারপর বাবা একরকম জোর করেই সৈকতের বাবাকে নিজের ঘরে নিয়ে যায়। আর সেখান থেকে ঘণ্টাখানেক পরে কাকু যখন বেরোচ্ছে তখন ওঁকে একটু অন্যরকম লেগেছিল দীপ্রর। সামনে এসে যখন দীপ্রর গাল টিপে আদর করলেন, তখন কেমন একটা গন্ধ বেরোচ্ছিল মুখ দিয়ে। আর চোখগুলোও একটু লাল লাল। রাতে বাবা যখন দীপ্রকে ধরে পেটাচ্ছে আর মা কাঁদছে তখন বাবার মুখেও একই গন্ধটা পেয়েছিল দীপ্র।

—ওরা পুলিশের লোক, ওদের অভ্যাস আছে। তুমি খেতে গেলে কেন? দীপ্রকে পেটানো বন্ধ করে বেসিনে ওয়াক তুলতে থাকা বাবার দিকে প্রশ্নটা ছুড়ে দিয়েছিল মা।

—উনি পকেট থেকে বোতলটা বের করে অফার করলেন, তখন মুখের উপর রিফিউজ করলে লোকটাকে অপমান করা হত।

—ছাড়ো তো তোমার অপমান। বাড়ি বয়ে ঘুষ চাইতে এসেছে, তার আবার মান আছে নাকি?

—ঘুষ না-চেয়ে তোমার ছেলেকে যদি জেলে ভরে দিত, ভালো হত খুব? তার চেয়ে আমি বলব...

—ন'বছরের বাচ্চার জেল হয় না। মা ফোঁস করে উঠল।

—আরে বাবা হারাসমেন্ট তো হয়। আর হারাসমেন্ট শুধু ওরই হত না, ওর সূত্রে আমার, তোমার। হারামজাদাকে মেরেই ফেলব আজ। ওকে কে বলেছিল অন্ধকারে ওই ঘুরঘুট্টি মাঠে যেতে? আর গিয়েছিল তো গিয়েছিল, ওইসব কথা গাবানোর কী দরকার? বাবা আবার দীপ্রর চুলের মুঠি খামচে ধরল।

—আমি বলি কী, ওকে হস্টেলে পাঠিয়ে দাও।

—গতবার তো তুমিই বাধা দিয়েছিলে। আমি ফর্ম এনেও জমা করলাম না।

—ছেলেকে ছেড়ে থাকতে কোন মা রাজি হয়? কিন্তু, এই পরিস্থিতিতে ওকে বাড়িতে রাখার সাহস আমি দেখাতে পারব না। মায়ের গলাটা কেমন ভেঙে গেল শেষ দিকটায়।

—এখন তো চাইলেই পাঠাতে পারব না। ওই দারোগার পারমিশন নিতে হবে। শালারা ঘুষও খাবে, আবার মাতব্বরিও করবে।

—আমাদের ছেলেকে আমরা কোথায় পাঠাব, তার জন্য অন্য কারও পারমিশন নিতে হবে কেন?

—তোমার ছেলে যে মার্ডার কেসের সাক্ষী

তারপর বাবা একরকম জোর করেই সৈকতের বাবাকে নিজের ঘরে নিয়ে যায়। আর সেখান থেকে ঘণ্টাখানেক পরে কাকু যখন বেরোচ্ছে তখন ওঁকে একটু অন্যরকম লেগেছিল দীপ্রর। সামনে এসে যখন দীপ্রর গাল টিপে আদর করলেন, তখন কেমন একটা গন্ধ বেরোচ্ছিল মুখ দিয়ে। আর চোখগুলোও একটু লাল লাল। রাতে বাবা যখন দীপ্রকে ধরে পেটাচ্ছে আর মা কাঁদছে তখন বাবার মুখেও একই গন্ধটা পেয়েছিল দীপ্র।

boierpathshala.blogspot.com

হয়ে বসে আছে। বাবা চিৎকার করে উঠল।

অনেক বছর পর হস্টেলে রাত জেগে পড়াশোনা করতে করতে দীপ্রর মনে হয় যে সেদিন সন্ধ্যায় রবিনদা আর শিপ্রাদিকে একসঙ্গে না-দেখলে ওকে বাড়ি ছেড়ে হস্টেলে চলে আসতে হত না। কিন্তু কমমেট পলাশকে গল্পটা করতেই পলাশ ওকে বলে যে, ভুলটা দেখায় হয়নি, হয়েছিল দেখার পর ঘটনাটার কথা বলে ফেলায়। সামান্য কিছুক্ষণ তর্ক করে পলাশের কথা মেনে নিয়েছিল দীপ্র। সত্যিই তো, যদি বাবা-মাকেও না বলত ঘটনাটা? যদি মুখ না খুলত ভুলে?

ফেরার রবিন দেড় মাসের মাথায় পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। আর বেশ কয়েকবছর বাদে কে জানে কেন, গলায় নিজের লুঙ্গিটা পেঁচিয়ে ঝুলে পড়ে জেলের ভিতরেই। খবরটা কেউ দীপ্রকে জানায়নি। খবর কাগজের সাত নম্বর পাতায় ও একদিন তিন লাইনের খবরটা দেখে। তখন দীপ্রর ক্লাস টেন বা ইলেভেন। খবরটা বারকয়েক পড়ে ওর একটা অদ্ভুত কথা মনে হয়। শিপ্রাদিকে গলা কেটে খুন করা হয়। আর রবিনও নিজের গলায় ফাঁস দেয়। তাহলে যে কণ্ঠে শব্দের বাস, সেই কণ্ঠই সব নষ্টের মূল?

—তুই এত চুপচাপ হয়ে গিয়েছিস কেন? হস্টেলে কথা বলিস না বন্ধুদের সঙ্গে? মা জিজ্ঞেস করেছিল একবার বাড়িতে ছুটি কাটাতে এলে।

উত্তর না দিয়ে সামনে থেকে উঠে গিয়েছিল দীপ্র। কথা বলার পরিণাম কী হয়, সে তো ও নিজের শৈশব-কৈশোর দিয়ে জানে।

—বিশেষ করে বিপদের কথা তো কাউকেই বলবি না। কারণ, যাকেই বলবি সে-ই অন্য পাঁচজনের সঙ্গে কথা বলে, বিপদ কমানোর বদলে বাড়িয়ে দেবে। পলাশ বলেছিল।

কথাগুলো গেঁথে গিয়েছিল দীপ্রর মনে। তাই যতটুকু প্রয়োজন তার থেকে একটু কমই কথা বলত ও। আর কোনও সমস্যায় পড়লে চুপ করে যেত একদম।

দিল্লি থেকে ব্রাসেলস-এর পথে এরোপ্লেনটা যখন এয়ার টার্বুলেন্সে পড়ে কাঁপতে শুরু করল, হঠাৎ একবার একটু ওপরে উঠে নীচে নেমে গেল দুম করে, অধিকাংশ যাত্রীই চিৎকার করে উঠল। কাঁদতে শুরু করল অনেকে। কিন্তু প্রবলেমে পড়লে কাউকে কিছু বলতে হয় না, এই বিশ্বাসে দীপ্র চুপ করে রইল একদম। একবার শুধু আমেরিকা আর বিপদের ভিতরকার কানেকশন মনে করে হাসি পেয়ে গেল ওর।

আচ্ছা শিপ্রাদিকে তো রবিনদা আটকাতে চাইছিল, কিন্তু, ও আমেরিকা গেলে কার কী? প্রশ্নটার কোনও উত্তর মনে আসার আগেই প্লেনটা দুলে উঠল ভয়ংকরভাবে। আর বাঁ পাশের লোকটার মাথা দীপ্রর ঘাড়ের উপর এসে পড়ল।

সব বিপদই একসময় না একসময় ফুরিয়ে যায়। তবে কোনও কোনও বিপদ ফুরিয়ে যাওয়ার আগে অনেককে শেষ করে দেয়। সুনামি হওয়ার কয়েকদিন পর চেন্নাইতে থাকা ওদের এক আত্মীয় কলকাতায় এসেছিল। গরমের ছুটি চলছিল বলে দীপ্র তখন বাড়িতেই। তো ওর সেই কাকুর ক্যামেরায় বন্দি ছবিগুলো দেখতে দেখতে দীপ্র চমকে উঠেছিল। একদিন আগে আর পরে এমন আমূল পরিবর্তন হতে পারে একটা জায়গার? যা ছিল সুজলা-সুফলা, তা এরকম ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতে পারে? কয়েক ঘণ্টার তাণ্ডবে?

যদি প্লেনটা ভেঙে পড়ত, তাহলে কয়েক মিনিটের ভিতরে একই জিনিস হত না কি? কিন্তু হল যে না, প্লেনের ভিতরে থাকা যাত্রীরা সবাই যে বেঁচে গেল, তার জন্য কাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত? প্লেনের ইঞ্জিনকে? প্রকৃতিকে? ভাগ্যকে? সবচেয়ে বেশি করে হয়তো বা ভাগ্যকেই। সে যতদিন যাকে বাঁচিয়ে রাখে ততদিন তার মরার জো নেই।

দীপ্রর ঘাড়ে নিজের মাথা দিয়ে সজোরে গুঁতিয়ে দেওয়া লোকটার মুখ থেকে খানিকটা লালা দীপ্রর শার্টে লেগে গিয়েছিল। সেই সাংঘাতিক তোলপাড়ের ভিতর ব্যাপারটা খেয়াল না করলেও প্লেন আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে জিনিসটা দেখে কেমন একটা ঘেন্না করল দীপ্রর। ও টয়লেটে যাবে বলে সিটবেল্ট খুলে উঠে দাঁড়াল।

চলন্ত একটা বিমানের টয়লেটে শার্টে লিকুইড সাবান ঘষতে ঘষতে কেমন একটা হাসি পেয়ে গেল

দীপ্রর। একটুক্ষণ আগেই যেখানে বাঁচবে না মরবে ঠিক ছিল না, সেখানে একটা লোকের থুতু শার্টে লেগেছে বলে...

২

নিজের সিটের সামনে ফিরে দীপ্র দেখল, জানলার ধারের লোকটা গুম হয়ে বসে আছে। কিন্তু মাঝখানের লোকটা নেই। বসলে আবার উঠতে হবে ভেবে, 'আইল' সিটের ধারে দাঁড়িয়েই এদিক-ওদিক তাকাল দীপ্র। আর তাকাতেই দুটো সিট আগে, ডান দিকে, লোকটাকে গভীর চুম্বনে আবদ্ধ দেখল। ওর পার্টনার একটা নীল চোখের ফরাসি বা জার্মান সুন্দরী। দিল্লি থেকে প্লেনে ওঠার সময় মেয়েটাকে দেখেছে দীপ্র। বোর্ডিং পাস নেওয়ার লাইনে ওর ঠিক পিছনেই ছিল। মোবাইলে কারও সঙ্গে কথা বলছিল দীপ্রর অচেনা একটা ভাষায়। প্লেনে উঠে হারিয়ে গিয়েছিল, যেমন যায়। দীপ্র নিজের লাগেজ উপরে তুলে ধারের সিটে বসে একটা ম্যাগাজিনে চোখ রেখেছিল। আর একটু পরে উঠে দাঁড়িয়েছিল মাঝখানের সিটে বসা লোকটাকে জায়গা করে দিতে। কিন্তু কোথাও তো এই লোকটার সঙ্গে ওই মেয়েটার পরিচয়ের কোনও চিহ্ন দেখেনি যাত্রাপথে। তাহলে হঠাৎ ওর এই বাথরুমে যাওয়ার সুযোগে কি এমন ঘটল যে দু'জন দু'জনের মুখে মুখ ডুবিয়ে একেবারে অন্য একটা পৃথিবীতে হারিয়ে গিয়েছে?

হারিয়ে যাক, তলিয়ে যাক, দীপ্রর কী? বাড়ির থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, মায়ের হাতের অমৃত ভুলে বছরের পর বছর হস্টেলের ট্যালটেলে ডাল আর কাঁটাওয়ালা মাছ খেয়ে দীপ্র একটাই জিনিস আচিভ করেছে শুধু— কয়েকটা পরীক্ষায় ভালো কিছু নম্বর। আর সেই রেজাল্টের জোরে ও আজ পিএইচডি করতে যেতে পারছে আমেরিকার একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

—সারাটা জীবন তোর থেকে দূরে থাকাই আমার নিয়তি। সেই কোন ছোটবেলায় হস্টেলে চলে গিয়েছিলি তারপরে আর ছুটিছাটা ছাড়া বাড়িতে ফিরলিই না। আর এখন তো সাত সমুদ্র পেরিয়ে চলে যাচ্ছিস। পিএইচডি কমপ্লিট করে যখন ফিরবি, কে জানে বেঁচে থাকব কি না। মা কেঁদে ফেলেছিল দীপ্রর জন্মদিনের দিন।

দীপ্রর ইচ্ছে হয়েছিল বলে, আমি তো দূরে যেতে চাইনি। তোমরাই আমায় পাঠিয়ে দিয়েছিলে হস্টেলে। সেটা না করে যদি আমায় নিয়ে অন্য এলাকায় চলে যেতে এই বাড়িটা বিক্রি করে দিয়ে, তাহলে হয়তো আমার শৈশব-কৈশোর বাবা-মা'কে ছাড়া কাটাতে হত না।

ইচ্ছে হলেও কথাগুলো বলেনি দীপ্র। ওর জন্মদিন বলে হাই-প্রেশার নিয়েও নিজের হাতে পায়েস রেঁধে যে মা সামনে বসে খাইয়ে দিচ্ছে, তাকে কোন সন্তানই বা মুখ ফুটে কথাগুলো বলতে পারে?

বাবা হাসতে হাসতে বলছিল, আমেরিকা গেলে তো চট করে কেউ ফেরে না, ওখানেই সেটল করে যায়। তোমার ছেলেও ফিরবে কি না দেখো। কে বলতে পারে, হয়তো ওখানেই কোনও মেমসাহেবকে মনে ধরে গেল আর তারপর তাকেই বিয়ে করে নিল।

মা ঝাঁঝিয়ে উঠেছিল, আমি আমার ছেলেকে চিনি। মা'কে না দেখিয়ে নিজের বিয়ের পাত্রী পছন্দ করবেই না ও। কী রে বাবু, তাই তো?

দীপ্র কোনও উত্তর না দিয়ে পায়েস খাওয়ায় মন দিয়েছিল। মা যদি জানত যে এমএসসি পড়ার সময় ও কেন সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বাড়িতে ফিরে আসেনি, কেন হস্টেলে থেকে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করার পর ইউনিভার্সিটি জীবনটাও হস্টেলেই কাটিয়েছিল, তাহলে হয়তো ওকে এই সার্টিফিকেট দেওয়ার আগে দু'বার ভাবত। কিন্তু দীপ্র যে ততদিনে বোবা হয়ে গেছে। নিজের কোনও দেখা বা অনুভব ও যে আর ভাগ করে নিতে পারে না, কারও সঙ্গেই। তাই সুকন্যার সঙ্গে ওর সম্পর্কের কথাটাও বাড়ির কাউকেই বলতে পারেনি। বাবা-মা তো দূর, ওর থেকে আট বছরের ছোট বোনটাকেও নয়, যার দু'বছর বয়সে ও হস্টেলে চলে যায়।

সেই বোন দেয়ালি, ওকে আর সুকন্যাকে একদিন দেখে ফেলেছিল প্রায়। একটা মাল্টিপ্লেক্সে ওরা দু'জন সিনেমা দেখতে গিয়েছে আর সেখানে দেয়ালিও গিয়েছে নিজের স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে। দীপ্র খুব কম কথা বলত বলে সুকন্যা একটু বেশিই বকবক করত। আর ওর সেই কথার তোড়ের মধ্যেই দীপ্র হঠাৎ খেয়াল করে যে উলটোদিক থেকে বোন আর বোনের বন্ধুরা এগিয়ে আসছে। পলকে সরে যায় দীপ্র। কথা বলতে থাকা সুকন্যা প্রথমটায় খেয়ালও করতে পারে না দীপ্রর সেই অনুপস্থিতি। একটা বড় থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে দীপ্র দেখে, দেয়ালিরা কোন সিনেমার টিকিট কাটছে। পনেরো-ষোলো'র মেয়েদের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসের ফলেই সিনেমার নামটা দীপ্রর কান অবধি পৌঁছে যায়। দু'মিনিট পরে বেরিয়ে এসে অন্য একটা সিনেমার টিকিট কাটে দীপ্র এবং সুকন্যাকে নিয়ে সেটায় ঢোকে।

—তুমি কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছিলে? সুকন্যা অবাক হয়ে জানতে চায়।

—অসহ্য বাথরুম পেয়েছিল। দীপ্র জবাব দেয়।

—আমাকে বলে গেলে পারতে। সুকন্যা একটু অভিমানের গলায় বলে।

দীপ্র চুপ করে যায়। ওই বলতে পারে না বলেই তো না-বলে সরে গিয়েছিল। নইলে দেয়ালি তো ওর ছোট বোন, অফিসের বস তো নয়। কী অসুবিধে হত তার মুখোমুখি হলে? কিন্তু ওই যে বলতে হবে, কে সুকন্যা, কী সম্পর্ক ওদের দুজনের, কতদিন ধরে চলছে এইসব, তারপর আবার দেয়ালিকে অনুরোধ করতে হবে, মা'কে এক্ষুণি কিছু না-বলার জন্য। এতগুলো কথা খরচ করার ভয়েই সরে গিয়েছিল দীপ্র। হলের অন্ধকারে সুকন্যার ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে, সুকন্যার ব্রা'র ভিতর হাত ঢুকিয়ে নিজের সেই অক্ষমতার ক্ষতিপূরণ দিতে চেষ্টা করেছিল।

কিন্তু শরীর আনন্দের হলেও, একটা সময়ের পর ক্লান্তিকর। মানুষ তো নিজের ভালোবাসার মানুষের কথাও শুনতে চায়। একতরফা বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে গিয়ে সুকন্যা তাই একদিন সম্পর্কটা থেকে বেরিয়ে গেল। আর বেরিয়ে গেল দীপ্রকে কিছু না-বলে। ইউনিভার্সিটির উলটো ফুটে চা খেতে গিয়েছিল দীপ্র। ওকে ডেকে একটা আধো-অচেনা ছেলে আচমকা বলল যে, সুকন্যা নাকি ঝিলের ধারের মাঠটায় সজীবের মাথা কোলে নিয়ে শুয়ে আছে। আর ওর ব্লাউজের বোতামগুলো সব খোলা। কথাটা বলেই নিজের নাম না জানিয়ে ধাঁ হয়ে গেল ছেলেটা।

সুকন্যাকে সেদিন সকালে শাড়ি পরা অবস্থায় দেখেছিল বলেই দোকানিকে একটা কুড়ি টাকার নোট দিয়ে, চেঞ্জ না-নিয়ে, তিন লাফে রাস্তা পেরিয়ে ইউনিভার্সিটিতে ঢুকে ছুটতে ছুটতে ঝিলের ধারের মাঠটায় এসে পৌঁছল দীপ্র। আর ওই অন্ধকারেও মুহূর্তের মধ্যে দু'চোখ দিয়ে স্ক্যান করে নেয় পুরোটা। হ্যাঁ, ওই তো দুটো ছায়ামূর্তি। ভয়েই নিশ্চয়ই। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ওদের কাছে পৌঁছে দীপ্র শোনে সজীব বলছে, '...ফুরায় এ জীবনের সব লেনদেন/থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার, বনলতা সেন'।

ওর বলা শেষ হতেই সুকন্যা ঠোঁট নামিয়ে সজীবের ঠোঁটে একটা চুমু খেয়ে বলে, আর একবার বলো। আর তখনই দীপ্রর দিকে চোখ যায় ওর।

—এগুলো কী হচ্ছে? দীপ্র বলে।

—যা হওয়ার ছিল তাই। আমি কথা বলতে না পারা একটা রোবটের সঙ্গে কোনও রিলেশনে থাকতে চাই না। ইউ নো দীপ্র, তোমার আস্ত একটা শরীর হলেই চলবে। কিন্তু আমি একটা মেয়ে তো, তাই আমার নিজের জন্য একটা ছেলে চাই, একটা মানুষ চাই।

দীপ্র চিৎকার করে বলতে চেয়েছিল, আমিও মানুষ। বিশ্বাস করো মানুষ আমিও। কিন্তু সেই ছোটবেলার অন্ধকারটা এসে ওর গলা টিপে ধরেছিল আবার।

লোকটা যখন ফিরে এল দীপ্র নিজের সিটে বসে পড়েছে। একটা কৃতজ্ঞতার হাসি হেসে দীপ্রকে পাশ কাটিয়ে নিজের সিটে বসে লোকটা হঠাৎ করে একটা চকোলেটে বার দীপ্রর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, বেলজিয়ান চকোলেট। দ্য বেস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড।

দীপ্র ওর কথার উত্তরে কিছু না-বলে ঘাড় নাড়ে। তারপর চোখ সরিয়ে নিয়ে জানলা দিয়ে বাইরের ককপিটের আকাশের দিকে তাকায়।

লোকটা সেই অভিব্যক্তিকে পাত্তা দিয়ে জিজ্ঞেস করে, ক্যান ইউ ডু মি আ লিটল ফেভার?

(চলবে...)

হলের অন্ধকারে সুকন্যার ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে, সুকন্যার ব্রা'র ভিতর হাত ঢুকিয়ে নিজের সেই অক্ষমতার ক্ষতিপূরণ দিতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু শরীর আনন্দের হলেও, একটা সময়ের পর ক্লান্তিকর। মানুষ তো নিজের ভালোবাসার মানুষের কথাও শুনতে চায়। একতরফা বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে গিয়ে সুকন্যা তাই একদিন সম্পর্কটা থেকে বেরিয়ে গেল। আর বেরিয়ে গেল দীপ্রকে কিছু না-বলে। ইউনিভার্সিটির উলটো ফুটে চা খেতে গিয়েছিল দীপ্র। ওকে ডেকে একটা আধো-অচেনা ছেলে আচমকা বলল যে, সুকন্যা নাকি ঝিলের ধারের মাঠটায় সজীবের মাথা কোলে নিয়ে শুয়ে আছে। আর ওর ব্লাউজের বোতামগুলো সব খোলা।

boierpathshala.blogspot.com

পর্ব ২

থাকে শুধু অন্ধকার

■ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

রাস্তায় বেরিয়ে একটু অবাক হল সুচন্দ্রা। যখন অফিসে ঢুকেছিল তখন চড়চড় করছে রোদ, আর এখন কীরকম মেঘে মেঘে ঢেকে গিয়েছে গোটা আকাশ। এবছর খুব হচ্ছে এরকম। আবহাওয়ার কোনও স্থায়ী পরিবর্তন হয়ে গেছে কি, যে কেউ কোনও পূর্বাভাস মেলাতে পারছে না? দুপুর বারোটায় চারিদিক রোদে ভেসে যাচ্ছে, হো একটার সময় মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হল। আবার দুটোয় আকাশ পরিষ্কার। চারটের সময় ফের ঝেঁপে বৃষ্টি। আবহাওয়াও কি মানুষকে দেখে শিখছে— ক্ষণেক্ষণে কীভাবে রং পালটাতে হয়। যা করবে, যা করতে যাচ্ছে, আগের মুহূর্ত পর্যন্ত তার উলটো কথা বলে যেতে হয়। মানুষ না শেখালে কে শেখাল ওকে? অবশ্য হতে পারে, মানুষের বাবা ছাত্র হবে না আবহাওয়া। পরের বছরই আবার নিজের ধর্ম, নিজের বিশ্বাসে ফিরে যাবে। শুধু এলাহবাদটা মানুষের মতো হয়ে মানুষকে বিপদে ফেলে, মজা দেখতে চাইছে।

ছাতা না-নিয়ে বেরোবার জন্য নিজের ওপরই রাগ হল সুচন্দ্রার। ওকে বিপদে ফেলে মজা দেখার সুযোগ ও নিজেই করে দিচ্ছে ভেবে। এই মজাটা মানুষ ওর থেকে আগেই পেয়েছে, তাই আবহাওয়াকে এই মজা পেতে দিতে চাইছিল না সুচন্দ্রা। কিন্তু তা পাবে বলেই হয়তো বৃষ্টি নামল। আবার অফিসে ফিরে যাবে-কি যাবে না ভাবতে ভাবতে সুচন্দ্রা একটা স্টেশনারি দোকানের শেডের নীচে এসে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে দেখল সামনের ওই গাড়িবারান্দাটাকে। যেখানে এই ক'দিন আগে অবধি বৃষ্টি নামলে দাঁড়াতে পারত। কিন্তু বাড়ি ভাঙা পড়ল, গাড়িবারান্দাও ঘুচে গেল তার সঙ্গে। মস্ত বড় মাল্টিস্টোরিড উঠছে ওখানে এখন। কত কত ফ্ল্যাট হবে সেখানে, কত মানুষ থাকতে আসবে। মানুষের থাকার প্রয়োজন এমন ভয়ংকর হয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে যে, রাস্তাঘাটে বিপদে পড়লে মানুষেরই দাঁড়ানোর মতো একটু জায়গা নেই। ওই গাড়িবারান্দায় কত লোক একটু ঘুমিয়ে নিত দুপুরে, কতজন ছাতু মেখে খেত, কত কুকুর-বিড়াল বাচ্চা দিত ভিতরের এক কোণে। গেল। সব হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। একটা গোটা যৌথ পরিবার গন উইথ দা উইন্ড হয়ে গেল, ঠিক ওদেরটা যেমন গিয়েছিল।

তবে ওদের বাড়ির ক্ষেত্রে কোনও প্রোমোটার এর জন্য দায়ী ছিল না। একসঙ্গে বাস করেও মনে মনে আলাদা হয়ে থাকা সব মানুষ ছিল। সময়-সুযোগ বুঝে সম্পূর্ণ বদলে গেল তারা, অকল্পনীয় আচরণ করতে লাগল। ওর বাবা যে ভাইদের বড় করেছেন, বাবার কারখানায় লক-আউট ঘোষণা হতেই তারা এমনভাবে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়াল যেন ওরা তিনশো মাইল দূর থেকে ভিক্ষে চাইতে এসেছে। যে বোনদের বিয়েতে বাবা গ্রেচুইটি ফান্ডের শেষ কপর্দকটুকু খরচ করে ফেলেছেন, তাদের বাড়িতে গিয়ে দুই ঘণ্টার বেশি তিন ঘণ্টা থাকলেই তাদের চোখে ফুটে উঠতে থাকত প্রশ্ন— চলে যাবে তো, নাকি খেতে যাবে বলে এসেছে?

না, মুখে বিশেষ কিছু বলেনি কেউই। কিন্তু চড়াই পাখি থেকে মানুষ, মুখে কেউ কিছু না বললেও বুঝতে পারে কে তাকে চাইছে আর কে চাইছে না। একটা কুকুরও তার কাছে গিয়েই লেজ নাড়ে যে শুধু বিস্কুট দেবে না, দেওয়ার সময় গায়ে একটু হাতও বুলিয়ে দেবে। তাহলে একজন মানুষ কতবার সেখানে যেতে পারে যেখানে সে অবাঞ্ছিত? আবার একমাত্র মানুষই বোধহয় আবার ফিরে যায় সেসব জায়গায় যেখানে তাকে চায় না কেউই। কেন যায়? সুচন্দ্রা নিজে কেন গিয়েছিল, ছোটকাকিমার মেয়ে ঝিমলি মাধামিকে দারুণ রেজাল্ট করায় যে পার্টি দেওয়া হয়েছিল, তাতে? এই ঝিমলিই যখন অনেক ছোট তখন কী একটা দরকারে ওদের ঘরে ঢুকতে গিয়ে দরজা বন্ধ দেখে জোরে ধাক্কিয়েছিল সুচন্দ্রা। ঝিমলি দরজা খুললে রেগেমেগে জিজ্ঞেস করেছিল, কেন ভরদুপুরে দরজায় ছিটকিনি আটকে রেখেছে?

সুচন্দ্রাকে পাথর করে দিয়ে ঝিমলি জবাব দিয়েছিল, মা বলে গিয়েছে, ডিম খাওয়ার সময় দরজা বন্ধ করে খেতে। নইলে তোমরা এসে চাইবে।

সুচন্দ্রা বেশ কিছুক্ষণ থম ধরে থেকে জিজ্ঞেস করেছিল, আমরা চাইব কেন? ক্লাস থ্রি কিংবা ফোরে পড়া ঝিমলি জবাব দিয়েছিল, তোমরা এখন খেতে পাও না তো, তাই।

ওই মুহূর্তে, 'একান্নবর্তী' শব্দটাকে নতুন করে আবিষ্কার করেছিল সুচন্দ্রা। 'একান্নবর্তী' মানে পরিবারের সবাই মিলে একই ভাত-ডাল-তরকারি ভাগ করে নেওয়া নয়, বরং পরিবারের একটা অংশ বিপদে পড়লে তাদের ফাঁকি দিয়ে ভালো-মন্দ খাওয়া। আর আজ যারা দরজা বন্ধ করে খাচ্ছে, কাল তারাই দরজা খুলে দেখিয়ে দেখিয়ে খাবে। সেই অপমানের হাত থেকে বাঁচতে গেলে এক্ষুনি পালিয়ে যেতে হবে বুঝেই ঝিমলির সামনে থেকে সরে এসেছিল সুচন্দ্রা। পরে, মেয়ের মুখ থেকে শুনেই হয়তো ছোটকাকিমা 'বাচ্চা মেয়ে কী বলতে কী বলেছে' বলে ভং করতে এসেছিল।

সুচন্দ্রার মা জবাব দিয়েছিল, 'আমার মেয়েটাও বাচ্চা ছিল একদিন। কই তখন তো বেকার দেওরদের ভাগ না-দেওয়ার জন্য দরজা বন্ধ করে ডিম খেতে হয়নি। মা-বাবা যা শেখায় না, বাচ্চারা তা শিখবে কেমন করে?'

তারপর থেকে ছোট কাকিমার সঙ্গে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সুচন্দ্রা পরে বুঝেছে, শুধু ঝিমলির মা নয়, ঝিমলির বাবাও তাই চাইছিল। কারণ, ছোটকাকুরা ভয় পেয়েছিল, যদি ওদের খাওয়াপরার দায়িত্ব নিতে হয়। তাই বুঝতে পারেনি ওদের পুরনো বাড়ি বিক্রিপাটা হয়ে যাওয়ার পর, ভাই-ভাই, ঠাঁই-ঠাঁই হয়ে যাওয়ার পর থেকে যাদের সঙ্গে আর কোনও সম্পর্কই ছিল না প্রায়, তারা নেমন্তন্ন করা মাত্রই সেই নেমন্তন্ন রক্ষা করতে যেতে হবে কেন।

—না গেলে ভাববে, হিংসে থেকে যাচ্ছিস না। মা বলেছিল।

—একটা হাটুর বয়সী মেয়েকে হিংসে করতে যাব কোন দুঃখে? সে ভালো রেজাল্ট করল না ফেল করল, কী এসে যায় তাতে? সুচন্দ্রা অবাক হয়েছিল মায়ের কথা শুনে।

—এসে যায়। সম্পর্ক নেই বললেই তো সম্পর্ক চলে যায় না। লোকজনের চোখ থাকে, সমাজের

ঝিমলি যখন অনেক ছোট, তখন কী একটা দরকারে ওদের ঘরে ঢুকতে গিয়ে দরজা বন্ধ দেখে জোরে ধাক্কিয়েছিল সুচন্দ্রা। ঝিমলি দরজা খুললে রেগেমেগে জিজ্ঞেস করেছিল, কেন ভরদুপুরে দরজায় ছিটকিনি আটকে রেখেছে? সুচন্দ্রাকে পাথর করে দিয়ে ঝিমলি জবাব দিয়েছিল, মা বলে গিয়েছে, ডিম খাওয়ার সময় দরজা বন্ধ করে খেতে। নইলে তোমরা এসে চাইবে। সুচন্দ্রা বেশ কিছুক্ষণ থম ধরে থেকে জিজ্ঞেস করেছিল, আমরা চাইব কেন? ক্লাস থ্রি কিংবা ফোরে পড়া ঝিমলি জবাব দিয়েছিল, তোমরা এখন খেতে পাও না তো, তাই। ওই মুহূর্তে, 'একান্নবর্তী' শব্দটাকে নতুন করে আবিষ্কার করেছিল সুচন্দ্রা। 'একান্নবর্তী' মানে পরিবারের সবাই মিলে একই ভাত-ডাল-তরকারি ভাগ করে নেওয়া নয়, বরং পরিবারের একটা অংশ বিপদে পড়লে তাদের ফাঁকি দিয়ে ভালো-মন্দ খাওয়া। আর আজ যারা দরজা বন্ধ করে খাচ্ছে, কাল তারাই দরজা খুলে দেখিয়ে দেখিয়ে খাবে।

boierpathshala.blogspot.com

চোখ থাকে। মা ভাবাল দিয়েছিল।

সেই সমাজ, সেইসমস্ত লোকজনকে অস্বীকার করতে না-পেরেই সুচন্দ্রা গিয়েছিল ছোটকাকিমার নতুন ফ্ল্যাটে। আর যাওয়ার পর অনেক নকল ভালো ব্যবহার, মিথ্যে মিষ্টি কথা শুনতে শুনতে ও আবিষ্কার করেছিল ভিতরের সেই খারাপ লাগাকে। ছোটকাকুর বৈভবের পাশাপাশি নিজের স্ত্রীগল দেখে যা আরও বেশি হয়েছিল। ছোটকাকিমারা তো ওর ম্যাথের বাইরে চলে গিয়েছিল, শুধু-শুধু ওদের বাড়িতে গিয়ে সুচন্দ্রা নতুন করে টের পেল যে, ওর জীবন ওকে সেই বন্ধ দরজার সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে যার ওদিকে কেউ ডিম খাচ্ছে। ভাগ চাওয়ার মতো ভিখিরি ও নয়, কোনওদিন ছিলও না। কিন্তু অন্যেরা পাচ্ছে আর আমি বঞ্চিত হচ্ছি আনলে কার না খারাপ লাগে? সুচন্দ্রারও লেগেছিল। ও তো আর সন্ন্যাসিনী নয়।

দোকানের শেডের নীচে দাঁড়িয়ে থাকা একটা লোক বৃষ্টির সুযোগ নিয়ে একটু ঘেঁষে দাঁড়িয়ে গায়ে-গা ঠেকানোর চেষ্টা করছিল। একবার ঠেকালও। সুচন্দ্রা মুখ ঘোরাতেই চোখ নামিয়ে সরে দাঁড়াল একটু। সুচন্দ্রা বিরক্ত হলেও, রেগে গেল না। ওর কেমন ওই লোকটাকেও বঞ্চিত বলে মনে হল। নারী শরীরের প্রতি পুরুষের যে আদিম টান সেই টান মেটানোর মতো সাধ্য হয়তো লোকটার নেই। বাড়িতে বউ নেই আবার বাজারে গিয়ে মেয়ে কেনার টাকা বা সাহস নেই। কিংবা হতেই পারে দুটোই আছে তবু...

এই দৃষ্টিভঙ্গিই সর্বনাশ করে ওর। সুচন্দ্রা জানে। তবু যেখানে খিস্তি করে ধুইয়ে দেওয়া উচিত সেখানেও বিশেষ কিছু বলে উঠতে পারে না ও। তাই হয়তো ওর যতটা পাওয়ার তার থেকে অনেক কম পায়। ঠকে যায় প্রতি মুহূর্তে। তবু রক্তের মধ্যে এমনভাবে মিশে গিয়েছে এই ব্যাপারটা যে চাইলেও খুব বেশি জঙ্গি হতে পারে না। ঠাকুমা যখন বেঁচে ছিল, বলত, 'ঘটি ঠুকলে আওয়াজ হবে, আমার এই নাতনিটাকে ঠুকলে আওয়াজ হবে না।'

ঠাকুমা চলে গিয়েছে আজ অনেকদিন। সর্বত্রই আওয়াজ এখন অনেক বেশি। তবু সুচন্দ্রার মন বলে, এমন কেউ নিশ্চয়ই আছে যে, ওর এই মুখ বুজে সহ্য করাকে দুর্বলতা নয়, আভিজাত্য হিসেবে দেখবে। আচ্ছা ওই যে ভদ্রমহিলা ঝুমালির বিয়েতে ওকে দেখে যেচে আলাপ করলেন, তারপর মোবাইল থেকে একটা ছেলের ছবি দেখিয়ে বললেন, 'ওর নাম দীপ্র, ওর জন্য তোমায় খুব পছন্দ হয়েছে আমার', তিনি কি ইয়ার্কি মারছিলেন, নাকি সত্যি-সত্যিই ছেলের বউ করতে চান সুচন্দ্রাকে? চাইলে পরে ছেলে আমেরিকা চলে যাওয়ার আগেই একদিন এলেন না কেন ওদের বাড়িতে? ছেলেকে সঙ্গে করে? ভদ্রমহিলাকে মুখের উপর বলতে না-পারলেও, সুচন্দ্রারও যে পছন্দ হয়েছে দীপ্রকে।

৪

ছোট থেকে খুব স্মার্ট আর অ্যাট্রাকটিভ বলে মধুরার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, দুর্দান্ত কোনও পাত্র এসে ওকে পক্ষীরাজে চড়িয়ে বের করে নিয়ে যাবে রামকালীতলার ওই গলি থেকে। কিন্তু ওর কপালে ঝঞ্ঝাট লেখা ছিল। নইলে বিজয়া দশমীর সন্ধ্যায় যখন ওর হাতদুটো নিজের একটা হাত দিয়ে পিছমোড়া করে রেখে এলাকা-বিখ্যাত মন্টু মাস্তান সিঁদুর দিয়ে দিল ওর সিঁথিতে তখন পাড়ার একটা লোকও কিছু বলল না কেন? মন্টু ডেঞ্জারাস ছিল সত্যি কিন্তু ও তো আর রিভলভার নিয়ে আসেনি, মধুরাকে সিঁদুর দিতে। পরে ঘটনাটার কথা ভাবলে মধুরার মনে হয়েছে যে, পাড়ার লোকরা খুশিই হয়েছিল ওর ওই হেনস্থা দেখে। দেখতে সুন্দর, মুখে মুখে কথা বলতে পারে, পড়াশোনাতেও ভালো, এমন একটা মেয়ের জায়গা ছিল না ওদের ওই এঁদো গলিতে। যে মেয়েরা রাস্তার কলে জলের লাইনে দাঁড়নো আর হাজার সেকেন্ডারি পাশ করতে না করতেই বিয়ের পিঁড়িতে বসাকে ভবিতব্য বলে জানত তাদের ভিড়ে নেহাতই বেমানান ছিল ও। তাই সমবয়সীদের এবং তাদের বাবা-মা'দের হিংসার পাত্রী ছিল মধুরা। সেই হিংসার পাত্রী জনসমক্ষে অপদস্থ হচ্ছে দেখলে, কে না খুশি হবে?

বাড়ি ফিরে ব্যাপারটাকে ঝেড়ে ফেলে দিতে চেয়েছিল মধুরা। শ্যাম্পু করে মাথা থেকে সিঁদুর ধুয়ে ফেলেছিল। কিন্তু সেই রাতে বুঝতে পারেনি যে ঘটনা ঘটা যতটা সহজ, মুছে ফেলা ততটা নয়। বুঝতে শুরু করেছিল পরদিন থেকেই। যখন ওকে দেখলেই কানাকানি, ফিসফাস কিংবা 'অ্যাই মন্টুর বউ' ডাক শুরু হয়ে গেল।

স্কুল খোলার পর ব্যাপারটা বাড়ল। ওর নামে, দিদিমণিকে নালিশ করতে গিয়ে একটা মেয়ে বলল, "মন্টুর বউ না আমায় মেরেছে, আমি ওকে, 'সিঁদুর খেয়েছে ইঁদুর' বলেছিলাম বলে।" আর দিদিমণি মেয়েটাকে ককার বদলে হেসে উঠলেন, জোরে। সঙ্গে হেসে উঠল গোটা ক্লাস, মধুরা ছাড়া। তবু দাঁতে-দাঁত চেপে ছিল মধুরা। কিন্তু কানাইদার দোকানে যেদিন ওই ছবিটা লাগল, সেদিন আর পারল না।

—এটা কি হল, কানাইদা? চিৎকার করে উঠেছিল স্কুল-ফেরতা পথে।

—কী আবার হবে, দেখতেই তো পাচ্ছিস একটা ছবি লাগিয়েছি। কানাই নির্লিপ্ত গলায় উত্তর দিয়েছিল।

—কিন্তু, কিন্তু...গলা বুজে গিয়েছিল মধুরার। আর ঝাপসা হয়ে আসা চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছিল সেই ছবিটা যেখানে মধুরাকে প্রায় জাপটে ধরে মন্টু ওর মাথায় সিঁদুর ঘষে দিচ্ছে। দশমীর সিঁদুরখেলার ছবি তুলতে প্রতিবারই ক্যামেরা নিয়ে আসত ফটোগ্রাফার কানাই আর সেবার সিঁদুরখেলার পাশাপাশি 'সিঁদুরদান'-এর ছবিও তুলে ফেলেছিল। শুধু তুলেই ক্ষান্ত হয়নি, নিজের দোকানের বাইরে লাগিয়েও দিয়েছিল ছবিটা আর লাগানোর কারণ হিসেবে বলেছিল যে লোকে খুব খাচ্ছে।

মধুরার মনে হয়েছিল, ওকেই খাচ্ছে, প্রত্যেকটা লোক। কামড়ে, ছিঁড়ে, চিবিয়ে। আর এমন একটা লোক কোথাও নেই যে ওকে বাঁচাবে। ওর বাবা কানপুরে চাকরি করে আর ন'মাসে-ছ'মাসে বাড়ি আসে একবার। এলেও কোনও ঝামেলায় বিশেষ একটা জড়াতে চায় না। শুধু কয়েকদিন 'রেস্ট' নিয়ে আবার কানপুরে ফিরে যায়। আসলে ওই চাকরি বাবার মজ্জা অবধি শুষে নিয়েছে বলে লোকটার অবশিষ্ট কিছু নেই। প্রেম, ভালোবাসা কিংবা সাহস কিছুই না। আর মা ওদের দুই বোনের পর ছেলের আশায় আবারও কনসিভ করে কীসব কমপ্লিকেশনে মরতে বসেছিল। শেষমেশ বাড়ি ফিরে এল, কিন্তু ছেলে হয়ে মরে যাওয়ার মানসিক যন্ত্রণা মায়ের শরীরটাকে আর সারতেই দিল না। মাথা ধরা, পেটে ব্যথা, গা-গোলানি একটা না-একটা কিছু লেগেই থাকত। মধুরার সঙ্গে কে কী করেছে, সেই খবরটা কানে যেতেই মা বিছানা থেকে উঠতে গিয়ে পড়ে গেল তিনবার, দু'বার বুকে হাত চেপে ধরে বোঝাতে চাইল ভীষণ ব্যথা হচ্ছে। সেই সময়, মধুরার দিদি মন্দিরার ভূমিকা ছিল আরও চমৎকার। যে বোনের সঙ্গে রূপে-গুণে কোনওদিন এঁটে উঠতে পারেনি, তার ওপর পৃথিবীর সব প্রতিশোধ একবারে নেওয়ার ওটাই সঠিক সময় বলে মনে হল ওর। মন্দিরা তাই ঘুরে-ফিরে দুটো কথাই বলতে থাকল মধুরাকে, 'আমাদের বংশের কোনও মেয়ে এমন একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসলে, ভাবাও যায়নি' আর 'মায়ের যদি কিছু হয়ে যায় তার জন্য কিন্তু শুধু তুই দায়ী থাকলি...'।

একবার একটা উইক এন্ড পার্টিতে কেউ কাউকে 'সুইসাইড' করার কথা বলছে শুনে মধুরা হেসে ফেলেছিল। সুইসাইড করার কথা মানুষ কখন ভাবে ওরা সত্যি জানে? মধুরা জানে। কারণ ও ভাবত। স্কুল থেকে ফেরার পথটা যখন কানাইয়ের ফোটো তোলার দোকানের সামনে থমকে দাঁড়াত, তখন প্রতিদিন ভাবত। আর সেদিনই করে ফেলবে এমন একটা জেদ নিয়ে বাড়ির কড়া নাড়ত। মা দরজা খুলে দিতে দিতে, 'মুখপুড়ি', 'বংশের মুখে কালি দিয়ে এসেছে' ইত্যাদি কত কথা শোনাত ওকে, কিন্তু মধুরার খুব কিছু আসত-যেত না। কারণ ও তো ঠিকই করে রেখেছে যে মরবে। ওই মরার সঙ্কল্প নিয়েই ও একটা ব্লেড লুকিয়ে নিয়ে কলঘরে যেত। কিন্তু শেষ অবধি কিছুতেই হাতের শিরা কেটে উঠতে পারত না। আর না-পেরে মাথা নিচু করে যখন বেরোত কলঘর থেকে তখনই শুরু হত ভয়। কীভাবে কাটবে সন্ধ্যা থেকে রাত্রির এই ঘণ্টা-মিনিট-সেকেন্ড? ঘুম আসুক, না আসুক বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ার আগে পর্যন্ত কীভাবে ফেস করবে ও নিজের মা, নিজের দিদি, ওকে নিজের মনে করে জ্ঞান দিতে চলে আসা পাড়াতুতো কাকিমা-জেঠিমাদের? মধুরা প্রথম-প্রথম কথার পিঠে কথা বলে বোঝানোর চেষ্টা করত যে ওর কোনও দোষ নেই ব্যাপারটায়। কিন্তু তাড়াতাড়িই বুঝে গিয়েছিল যে ওতে ঝামেলা আরও বাড়ে। বিপদে পড়া মেয়ের মুখে যুক্তির কথা শুনতে চায় না লোক, চায় মেয়েটা কাঁদুক। তবে না সিমপ্যাথির জোয়ার আসবে। সেই সিমপ্যাথি আদায়কে ঘেন্না করতে মধুরা, ঘেন্না করত অন্য মেয়েদের মতো হটহাট কেঁদে ফেলাটাকে। কারণ, যারা কাঁদে তাদের থেকে সাহস যে বরাবরই একটু বেশি ওর। সেই সাহসে ভর করে ও একদিন সেই ক্লাবে চলে গিয়েছিল যেখানে মন্টু ক্যারম খেলে। শীতের বিকেল, সন্ধে নেমে এসেছে আগেই, মধুরা স্ট্রেট মন্টুর সামনে গিয়ে বলেছিল, তুমি কি হিজড়ে নাকি পুরুষমানুষ?

চমকে গিয়েছিল মন্টু। প্রায় পনেরো সেকেন্ড কোনও কথাই বলতে পারেনি। তারপর জিজ্ঞেস করেছিল, কী বলতে চাইছ?

—যদি পুরুষ হতে সত্যি করে তাহলে যে মেয়েটার মথায় সিঁদুর দিয়ে এসেছ সবার সামনে, তাকে সারা দুনিয়ার লোক টিটকিরি দিচ্ছে দেখলে কিছু করতে, ভেজুয়ার মতো ক্যারম পিটতে না, বলেই ক্লাব থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল মধুরা। পিছন ফিরে তাকায়নি আর।

পরদিনই কানাইদা দোকান থেকে ওই ছবিটা নামিয়ে ফেলেছিল আর সপ্তাহখানেকের মধ্যে পাড়ার লোকের টিটকিরি একদম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। স্কুলের ব্যাপারটা আরও মজার। যে দিদিমণি মধুরাকে, 'সিঁদুরওয়ালি' বলে ডাকতে শুরু করেছিলেন, রাস্তায় বাইক দাঁড় করিয়ে দুটো ছেলে তাকে, 'মিষ্টি' করে কিছু বলে যাওয়ার পর, তিনি নিজে দায়িত্ব নিয়েছিলেন যাতে স্কুলে আর কেউ কিছু না-বলে মধুরাকে। মধুরাদের বাড়িতেও এসেছিল মন্টু। আর মন্দিরাকে জিজ্ঞেস করেছিল, মধুরার সঙ্গে থাকতে ওর কোনও অসুবিধে আছে কি না। মন্দিরা সেদিন সন্ধে থেকেই, 'বোন, আমার বোন' বলে ঢলে পড়তে শুরু করে মধুরার গায়ে। মা অবশ্য মাঝেমাঝেই 'মুখপুড়ি' কিম্বা অন্য কিছু বলে গাল পাড়ত মধুরাকে কিন্তু মা'কে মন্টু ঘাটাক, মধুরা চায়নি।

আসলে ও শুধু চেয়েছিল আগের মতো নিশ্চিন্তে দম নেওয়ার পরিসর আর সেটা ফিরে পেতে গিয়ে মধুরা আবিষ্কার করেছিল যে ন্যায়-অন্যায় কোনও ফ্যাক্টর নয়, আসল জিনিস হল পাওয়ার। আর সেই পাওয়ারের গুড-বুকে থাকার জন্য নিজেকে 'লয়াল' প্রমাণ করতে হয়। মন্টু বিশ্বাস করত যে মধুরা ওর প্রতি হান্ড্রেড পারসেন্ট লয়াল। আর সেই বিশ্বাস থেকেই ছেলে দেখে মন্দিরার বিয়ে দেওয়া থেকে মা মারা যাওয়ার পর শ্রাদ্ধশান্তির পুরো দায়িত্ব নেওয়া, মায় হাফ-দামে হাওড়ার ওই ফ্ল্যাট কিনিয়ে দেওয়া অবধি অনেক কিছু করেছে ওর জন্য মন্টু।

বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই আরও অনেক কিছুই করত। কিন্তু কেউ যদি মাতাল অবস্থায় চলন্ত ট্রেন থেকে নীচে পড়ে যায়, তাহলে আর কী বা করার? মধুরা তো মন্টুর ছবিতে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে মীরাবাঈ হয়ে সামনে বসে ভজন গাইবে বলে পৃথিবীতে আসেনি।

গুয়ালমার্টে অনেক খুঁজেও পোস্ট কিংবা বরি—দুটোর কোনওটাই পেল না মধুরা। শিকাগো, নিউ জার্সি কিংবা হিউস্টন হলে এত শ্রোগান্তি হত না। কিন্তু এই পাণ্ডব-বর্জিত অঞ্চলে শুধু সাদা চামড়া আর সাদা চামড়া। ক্বচিৎ কখনও কৃষ্ণাঙ্গ দু'-চারজন। ভারতীয়ই চোখে পড়ে না, বাঙালি তো দূরস্থান। জিনিসপত্রগুলো গাড়িতে তুলে, স্টার্ট করার আগে মধুরার মনে হল, ইউনিভার্সিটিতে রিসার্চ করতে এত জায়গা থেকে এত ছেলে আসে, একটা বাঙালি আসতে পারে না?

(চলবে)

আসলে ও শুধু চেয়েছিল আগের মতো নিশ্চিন্তে দম নেওয়ার পরিসর আর সেটা ফিরে পেতে গিয়ে মধুরা আবিষ্কার করেছিল যে ন্যায়-অন্যায় কোনও ফ্যাক্টর নয়, আসল জিনিস হল পাওয়ার। আর সেই পাওয়ারের গুড-বুকে থাকার জন্য নিজেকে 'লয়াল' প্রমাণ করতে হয়। মন্টু বিশ্বাস করত যে, মধুরা ওর প্রতি হান্ড্রেড পারসেন্ট লয়াল।

boierpathshala.blogspot.com

থাকে শুধু অন্ধকার

■ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

৫

নেয়ার্ক, লা-গার্ডিয়া আর জেএফকে— নিউ ইয়ার্কে এই তিনখানা এয়ারপোর্ট। তার ভিতরে লা-গার্ডিয়ায় মূলত ডোমেস্টিক ফ্লাইটগুলো চলাচল করে আর বাকিটা ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট হয় নেওয়ার্ক, নয়তো জেএফকে বিমানবন্দরে এসে নামে।

—তোর ফ্লাইট নেওয়ার্কে নামবে, সেই ব্যবস্থা করে দিলাম বুঝলি। দীপ্রর ট্রাভেল এজেন্ট পিনাকিদা সিগারেটে একটা টান দিয়ে বলেছিল।

—জেএফকে হলেই বা কি অসুবিধে হত? দীপ্র জানতে চেয়েছিল।

—জেএফকে-তে সাংঘাতিক চেকিং। একেবারে প্যান্ট-জামা খুলিয়েও চেক করে। আর তত্টা যদি নাও করে, এত প্রশ্ন করবে যে তোর মাথা খারাপ হয়ে যাবে।

—নেওয়ার্কে প্রশ্ন করবে না?

—প্রশ্ন না-করে তোকে আমেরিকায় ঢুকিয়ে নেবে? তুই পড়াশোনা করতে যাচ্ছিস, নাকি টুইন টাওয়ার ফাসে করতে, সেটা বুঝে নেবে না?

—ভিসার সময় একদফা বুঝে নিয়েছিল তো। আবার কী?

—বারবার পরীক্ষা দিতে হবে বাবা। দেশটা আমেরিকা। তবে মজার ব্যাপার জানিস, লাদেন ওই হাজার দশেক লোককে মারার আগে, আমেরিকার এয়ারপোর্টে সিকিউরিটি চেক প্রায় ছিলই না। লোকে হাঁটতে হাঁটতে রানওয়ে পর্যন্ত চলে যেত। প্লেনের সামনে দাঁড়িয়ে এ ওকে কিস করছে এরকম কত ছবি দেখেছি।

দীপ্র হেসে উঠেছিল পিনাকিদার কথা শুনে। ট্রাভেল এজেন্সিতে চাকরি করলে অন্যদের ঘোরা-বেড়ানোর গল্পগুলো কখন যেন নিজের হয়ে যায়। ফিনল্যান্ড থেকে ফ্লোরিডা সবই পরিচিত মনে হয়।

—মেমরা যদি ডান গালে চুমু খায় তাহলে তুই ওদের বাঁ গালে চুমু খাবি আর বাঁ গালে খেলে তুই ডান গালে। এটাই ওদের দেশের রীতি। ভুলে যাবি না। পিনাকীদা ওকে পাখি পড়ানোর ঢঙে বলেছিল।

দীপ্র তখন মজা পেলেও পরে ভেবেছে, কী দরকার ছিল পিনাকিদার, ওর জন্য এত ভাবার? ইউনিভার্সিটির উল্টো ফুটে চা খেতে এসে যার সঙ্গে পরিচয়, তার সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে এত চিন্তার কী দরকার? হয়তো, এটাই ওর দেশ-ওর শহরের ঐতিহ্য। আর সেই জায়গা ছেড়ে ও যেখানে যাচ্ছে, সেখানে প্রত্যেকটা মানুষই আলাদা একটা ইউনিট। কারও সময় নেই, অন্য কারও কথা ভাবার।

—তুই যদি আমেরিকার কোথাও হোঁচট খেয়ে পড়ে যাস, তাহলে কোনও আমেরিকান তোকে টেনে তুলবে না। সেটা এইজন্য নয় যে ওরা নিষ্ঠুর। ওদের ইউনিভার্সিটির সিনিয়র অমিতাভদা বলেছিল।

—তাহলে? দীপ্র একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করেছিল।

—তুলবে না কারণ আমেরিকানরা ভীষণ স্বাধীনচেতা। ওরা পড়ে গেলে তুই যদি ওদের তুলতে যাস তাহলে ওরা অপমানিত বোধ করবে। আর ওরা ভেবে নেবে যে তোর ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একইরকম। অতএব, সাধু সাবধান। অমিতাভদা জিভ দিয়ে একটা আওয়াজ করেছিল।

দীপ্রর অবশ্য তত কিছু মনে হয়নি কথাটা শুনে। ও তো ছোটবেলা থেকেই একা। আর ইন্ট্রোভার্ট বলে বদনাম থাকায় তেমন কোনও বন্ধুও জোটাতে পারেনি।

সুকন্যার সঙ্গে জড়িয়ে পড়াটাও একেবারেই অ্যাক্সিডেন্টালি। ওদের এক স্যার নিজের বাড়ির পুজোয় সব ছাত্র-ছাত্রীকে নেমন্তন্ন করাতেন আর কেউ একদিনও না এলে রাগ করতেন খুব। শুধু যে কেমিস্ট্রির ছেলেমেয়েরাই আসত স্যারের বাড়িতে তা নয়। সুকন্যাই তো ইতিহাসের ছাত্রী ছিল। আসলে অঞ্জনবাবু নিঃসন্তান, বিপত্নীক লোক ছিলেন বলে অনেকের সঙ্গে গল্পগুজবে পুজোর কয়েকটাদিন কাটাতে চাইতেন। খাওয়াদাওয়াও খুব ভালো হত সেই সূত্রে।

সেখানেই কায়দা মেরে ধুনুচি নাচ দেখাতে গিয়ে সুকন্যার শাড়িতে আগুন লেগে যায়। আর আগুন লাগতেই অন্যরা যখন চিৎকার জুড়েছে তখন দীপ্র কোনও কথা না-বলে একটা টান দিয়ে খুলে দিয়েছিল সুকন্যার শাড়িটা। সেই শাড়ি খুলতে গিয়ে দীপ্রর হাত পুড়ে যায় অল্প একটু। কিন্তু তার থেকে অনেক বেশি ছ্যাঁকা লাগে সুকন্যার মনে। বাদবাকি সবাই যখন আতঙ্কিত হয়ে হইচই করছে তখন একটা লোক নিঃশব্দে ওকে বাঁচানোর কাজটা করল, এটা এমনই একটা অভিঘাত তৈরি করেছিল সুকন্যার ভিতরে যে, ও নিজে থেকেই দীপ্রকে ফোন করে দেখা করতে চলে এসেছিল। দীপ্র যে খুব বেশি কথা বলতে পেরেছিল বা সুকন্যার ইমোশনের সঙ্গে তাল মেলাতে পেরেছিল, তা নয়। কিন্তু সুকন্যা তো তখন ইম্প্রেসড হয়েই আছে। ওদের তৃতীয় বা চতুর্থ দেখা হওয়ার দিন, সুকন্যা ট্যাক্সির ভিতর দীপ্রকে প্রায় জড়িয়ে ধরে বলেছিল, ও কী চায়।

সেই চাওয়াটা আর কিছুই নয়, ওই অষ্টমীর দিন দীপ্র যেভাবে ওর শাড়ি খুলে নিয়ে ওকে বাঁচিয়েছিল, সেভাবেই প্রতিটা রাতে ওর শাড়ি খুলে নিয়ে ওকে বাঁচাবে, মারবে, বাঁচাবে। কথাটা শুনেও দীপ্র শুধু বলেছিল, ও আচ্ছা।

সুকন্যা ওর শার্ট খামচে ধরে বলেছিল, আচ্ছা মানে কী? তোমার এক্সাইটেড লাগছে না? একটা সুন্দরী মেয়ে তোমায় নিজের থেকে এরকম বলছে, অন্য কোনও ছেলে হলে এতক্ষণে...

ওই সেদিন থেকেই হয়তো অন্য কোনও ছেলের সঙ্গে দীপ্রর তুলনা করতে শুরু করেছিল সুকন্যা। কিন্তু দীপ্র তো কেবলমাত্র দীপ্রই ছিল। এক্সাইটেড লাগলেও সে হাঁমাই করতে পারত না। আর তাতেই একসময় ক্লান্ত হয়ে গেল সুকন্যা। ওর মনে হতে লাগল, দীপ্র বোধহয় ইচ্ছে করে ওকে কষ্ট দেওয়ার জন্য এরকম করছে। দীপ্রর ভিতরের কোন জায়গাটা কী আঘাতে বন্ধ হয়ে গিয়েছে সেই খোঁজে যাওয়ার কোনও তাগিদ অনুভব করল না ও। দীপ্র নিজেও যে বলতে পেরেছিল তা নয়। সেই শৈশবের গল্প তুলে এনে সুকন্যাকে বোঝানো, কী হয়েছে, কেন হয়েছে... উফ বিরক্তিকর! ও তাই চেয়েছিল, সুকন্যা ওকে বুঝবে। কিন্তু বুঝল কই? আর না-বুঝে, সরে গিয়ে আরও বড় একটা ক্ষত তৈরি করে দিয়ে গেল। সেটা এইটাই যে মায়ের জোরাজুরি সত্ত্বেও আমেরিকা চলে আসার আগে ওই মেয়েটাকে দেখতে যেতে পারেনি ও। মেয়েটার ছবি দেখে ভালোই লেগেছিল,

কায়দা মেরে ধুনুচি নাচ দেখাতে গিয়ে সুকন্যার শাড়িতে আগুন লেগে যায়। আর আগুন লাগতেই অন্যরা যখন চিৎকার জুড়েছে তখন দীপ্র কোনও কথা না-বলে একটা টান দিয়ে খুলে দিয়েছিল সুকন্যার শাড়িটা। সেই শাড়ি খুলতে গিয়ে দীপ্রর হাত পুড়ে যায় অল্প একটু। কিন্তু তার থেকে অনেক বেশি ছ্যাঁকা লাগে সুকন্যার মনে। বাদবাকি সবাই যখন আতঙ্কিত হয়ে হইচই করছে তখন একটা লোক নিঃশব্দে ওকে বাঁচানোর কাজটা করল, এটা এমনই একটা অভিঘাত তৈরি করেছিল সুকন্যার ভিতরে যে, ও নিজে থেকেই দীপ্রকে ফোন করে দেখা করতে চলে এসেছিল। দীপ্র যে খুব বেশি কথা বলতে পেরেছিল বা সুকন্যার ইমোশনের সঙ্গে তাল মেলাতে পেরেছিল, তা নয়। কিন্তু সুকন্যা তো তখন ইম্প্রেসড হয়েই আছে।

boierpathshala.blogspot.com

মায়ের মুখে ওর কথা শুনেও। কিন্তু মেয়েটার নাম 'সুচন্দ্রা' শুনেই ও শক খেয়েছিল। নামের এত মিল, স্বভাবেও যদি সুকন্যার মতো হয় মেয়েটা?

ওর একসময়ের রুমমেট সুস্মিত বলত, ছেলেরা মেয়েদের সঙ্গে কথা বলে মেয়েদের সঙ্গে শোওয়ার জন্য। আর মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে শোয় যাতে কথা বলে-বলে মাথা খেতে পারে। খুব হেসেছিল দীপ্র কথাটা শুনে। কিন্তু হাসির বদলে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা ওর গলায় বলা পাকিয়ে উঠেছিল যখন ডায়মন্ড হারবারের সেই রিসর্টে সুকন্যা নিজের নাভির উপর থেকে দীপ্রর মুখটা সরিয়ে দিয়ে বলেছিল, আগে আমাকে বলো এই ট্যাটুটা দেখে তোমার কী মনে হচ্ছে।

—কী মনে হবে? ফুলের ভিতরে ফুল, তার ভিতরে ফুল, তার ভিতরেও ফুল।

—সে তো দেখাই যাচ্ছে। কিন্তু ওই ফুলের ভিতরে ফুল, তার ভিতরেও ফুল দেখে কী মনে হচ্ছে তোমার? দু'-তিন লাইনে বলো।

একটা শব্দও বলতে পারেনি দীপ্র। আর সেই না বলতে পারা সুকন্যার মুড এমন বিগড়ে দিয়েছিল যে অত নির্জনতা, অত সুযোগ সত্ত্বেও ওরা একে অন্যের হয়ে যেতে পরেনি। পুরোপুরি। জলের ভিতর বরফ না গলে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে যেমন হয়, তেমন একটা অস্বস্তি নিয়ে ফেরার রাস্তা ধরেছিল। গোটা পথটা একটাও কথা বলেনি সুকন্যা। শুধু ওর বাড়ির সামনের মোড়ে গাড়িটাকে যখন থামতে বলেছে দীপ্র তখন অস্ফুটে বলেছিল, ফালতু ফালতু তোমার অনেকগুলো টাকা খরচ হয়ে গেল আজ। কী করব, ওভাবে আমি পারি না।

তার দিন দশেকের ভিতরেই ইউনিভার্সিটির মাঠের ওই ঘটনা। আর সেদিনের পর থেকে সুকন্যার সঙ্গে কোনও কথাই বলেনি দীপ্র। এমনকী, রণজয় যখন এসে ওকে বলল যে সুকন্যা কেউ প্রশ্ন করলেই উত্তরে বলছে 'দীপ্র প্রেম করার সময়ই কিছু বলতে পারেনি, ব্রেকআপের আর কী বলবে', তখনও চুপ করেই ছিল।

চুপ করে থাকলেও ভিতরে মেঘ জমে জমে বিস্ফোরণ হয়। মা যখন ওই সুচন্দ্রা বলে মেয়েটার সঙ্গে কথা বলতে বলতে দীপ্রর হাতে ফোনটা ধরিয়ে দিতে গিয়েছিল তখন সরে এসেছিল দীপ্র। কিন্তু পরে মায়ের থেকে ফোনটা নিয়ে নম্বরটা ডায়াল করেছিল ও। আর ওপাশে একটা মেয়ের গলা শুনেই বলে উঠেছিল, আমি কিন্তু এক্সপ্রেসিভ নই। আপনার শরীরের কোথাও কোনও ট্যাটু থাকলে সেখানে চুমু খেয়ে কোনও কবিতা বলতে পারব না। তারপরও বিয়ে করবেন আমাকে? ওপাশ থেকে মেয়েটা হো হো করে হেসে উঠেছিল। আর দীপ্র রং নম্বর বুঝতে পেরে ফোনটা কেটে দিতে দিতে একটা নিঃশ্বাস ফেলেছিল।

তাড়াহুড়োয় 'সাত' ডায়াল করতে গিয়ে 'নয়' ডায়াল করে ফেলেছিল। কিন্তু কী হত, যদি সত্যি করে সুচন্দ্রাই ফোনটা ধরত?

৬

—হোয়াট সর্ট অফ ফেভার আর ইউ আসকিং ফর? দীপ্র জিজ্ঞেস করল ওর পাশের লোকটাকে।

—কিছু না। তুমি শুধু এই চারটে চকোলেট তোমার সঙ্গে, আই মিন তোমার হ্যান্ডব্যাগে ক্যারি করবে। ব্যাসেলসে সিকিওরিটি চেকিং-এর পর আমি আবার তোমার থেকে চকোলেটগুলো নিয়ে নেব।

—না, আমি এইসব করতে পারব না।

—তুমি বুঝতে পারছ না, একসঙ্গে এতগুলো চকোলেট নিতে দেয় না সিকিওরিটির লোকেরা। তাই আমি ভাবছিলাম, যদি তুমি আমায় একটু হেল্প করো তাহলে আমি চকোলেটগুলো বাইরে নিয়ে যেতে পারি। দে আর ভেরি গ্রেশাস ইউ নো।

—সরি, আই কান্ট। বলেই দীপ্র মুখ ঘুরিয়ে নিল লোকটার থেকে।

—আই থিঙ্ক উই বোথ আর গোইং টু আমেরিকা। সো, এইটুকু হেল্প তুমি আমায় করতেই পারতে। লোকটা বলল।

দীপ্র ওর কথার কোনও উত্তর না দিয়ে নিজের চোখ দুটো বন্ধ করে ফেলল।

চোখ বন্ধ করতেই ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল কলকাতা শহরের সেই ল্যাবরেটরি। দিনের পর দিন যেখানে বারো ঘণ্টা-চোদ্দ ঘণ্টা পরিশ্রম করেছে ও। জার আর বিকারে আধাআধি ঢেলে দিয়েছিল নিজের গোটা জীবনটাই। আর তার পরিণামেই হয়তো আজ এই আমেরিকায় যাওয়ার সুযোগ এসেছে ওর সামনে।

রিসার্চ কি ও ভারতে থেকেও করতে পারত না? দেশের লোকের ট্যাক্সের টাকায় মাস্টার্স করে, কোন চিতোর উদ্ধারের জন্য ও আমেরিকায় যাচ্ছে? আসলে তো যাচ্ছে নিজের কেরিয়ার গুছিয়ে নিতে। কিংবা হয়তো বা যাচ্ছে, এই কথা দিয়ে সবকিছু বোঝানোর দেশের থেকে বেরিয়ে কাজের মধ্যে দিয়ে যেখানে সব বোঝানো যায়, সেই দেশটার একটা অংশ হতে। পিএইচডি তো দীপ্র ভারতেই করছিল। বছর দেড়েক হয়ে গেল ও জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপ পেয়েছে। কিন্তু আমেরিকার সুযোগটা আসামাত্র ওর আর পিছনে ফিরে তাকানোর মন হয়নি। জলে যাক দেড় বছর, আবার নতুন করে শুরু করবে আটলান্টিকের পাড়ে গিয়ে, এমনটাই মনে হয়েছিল।

—সুকন্যার সঙ্গে ব্রেক-আপ হল বলেই কি তড়িঘড়ি দেশ ছাড়তে চাইছিস? অমিতাভদা জিজ্ঞেস করেছিল।

—জানি না। তবে আমার মনে হচ্ছে যে এই দেশটার সঙ্গেই আমার একটা ব্রেক-আপ হয়ে গিয়েছে। আর তাই যত তাড়াতাড়ি এই দেশটা থেকে বেরিয়ে যেতে পারি, ততই মঙ্গল। দীপ্র উত্তরে বলেছিল।

—মঙ্গলটা কার? তোর নিজের না দেশের? অমিতাভদা মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করেছিল।

—জানি না। হয়তো দু'জনেরই।

— পিএইচডি এখানেই শেষ করে পোস্ট-ডক করার জন্য আমেরিকায় গেলে তুই আরও অনেক বেটার ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেতিস। চাই কি বার্কলে বা প্রিন্সটন থেকে কাজ করতে পারতিস। কিন্তু এখন যেখানে যাচ্ছিস, সেটা তো একটা ধ্যাড়েড়ে গোবিন্দপুর। আমেরিকার গোবিন্দপুর, আই অ্যাডমিট। কিন্তু তাতে কী?

দীপ্র মনে মনে বলেছিল, তাতেই সবকিছু। আমেরিকায় জাহাজ ভেড়ানোর আগে কলম্বাস কি ভেবেছিল ও ফুরফুরে মোলায়েম একটা দেশে পা দিচ্ছে, নাকি তীব্র ঠান্ডা হাওয়ার ভিতরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা একটা রুক্ষ মহাদেশে জাহাজ ভেড়াচ্ছে? অজানাকে ভয় করলে আর যাই করা যাক জীবনের ঝুঁকি নেওয়া যায় না। আর দীপ্র ঝুঁকিই নিতে চাইছিল। কেন বলেনি যে ও আমেরিকায় যাওয়ার চেষ্টাচরিত্র চালাচ্ছে।

আগে থেকে জানিয়ে লাভ আছে কিছু? শেষমেশ তো সেই যেদিন যাওয়ার সেদিনই যেতে হবে। দীপ্র বলবে বলে ভাবল। তারপর কিছুই না বলে, হাসল অল্প একটু।

মা ভুকরে উঠল, তোকে সেই যে ছোটবেলায় হোস্টেলে রেখেছিলাম তার প্রতিশোধ নিবি বলেই তুই সারাজীবন আমাদের থেকে দূরে থাকার প্ল্যান করেছিস।

—এরকম কোনও প্রতিশোধ হয় না মা। তোমরা যেমন আমাকে ভালোবাসো, আমিও বাসি। কিন্তু আমার যা সাবজেক্ট তাতে উন্নতি করতে গেলে বিদেশে যেতেই হয়।

—গেলে যা, কিন্তু আমি বিয়ে দিয়ে দেব, যাওয়ার আগে। মা কীরকম ফাইনাল ডিসিশন শোনানোর ঢঙে বলল।

—পঁচিশ হয়নি তো এখনও। এখনই বিয়ে? বাবা হো হো করে হেসে উঠল।

—হাসির আছেটা কী? পঁচিশে বিয়ে হত না লোকের আগে? এখনও হয় না?

দেয়ালি চেঁচিয়ে উঠল, খুব হয়। আমাদেরই দু'-বছরের সিনিয়র সতীশ জয়সোয়াল বিয়ে করছে তো। হি ইজ ওনলি নাইনটিন।

—আমি বিয়ে করে নিলে তোর রাস্তা ক্লিয়ার হয় নাকি? হলে এখনই বল! ছেলেটাকে দেখে রাখি।

দীপ্রর কথায় লজ্জা পেয়ে দেয়ালি সরে গিয়েছিল। আর মায়ের হাত থেকে সুচন্দ্রার ফোটো হাতে নিয়ে লজ্জা পেয়েছিল দীপ্রও। মেয়েটাকে ওর ভালোই লেগেছিল যে ছবিতে! আর ভালোলাগার চাইতে বেশি করে জেগে উঠেছিল একটা প্রতিশোধস্পৃহা। যদি আমেরিকায় ঠিকঠাক কাজ করে উন্নতির মুখ দেখতে পায়, একটা বাড়ি, একটা গাড়ি কিনতে পারে কটপট, তাহলে একটা মেয়েকে নিজের জীবনে নিয়ে আসা খুব কিছু সমস্যার হবে না। আর সেদিনই আসল জবাবটা দেওয়া যাবে সুকন্যাকে। মেয়েদের কোলে মাথা রেখে শুয়ে যারা কবিতা আবৃত্তি করে, তারাই যে পৃথিবীর সবচেয়ে সফল লোক নয়, এই বোধোদয় হবে তো সেদিন সুকন্যার!

হোক, না-হোক, দীপ্র ওর স্মৃতি রোমন্থন করার জন্য বসে থাকবে না আর। নিজের জীবনটাকে ও যে তীব্র গতির রাস্তায় গড়িয়ে দিয়েছে, সেটা ধরেই এগিয়ে যেতে হবে।

—আপনি কী, কতটা আপনার ক্ষমতা, আপনাকে কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি প্রমাণ করতে হবে। একটা আবছা মুখ শেষরাতের স্বপ্নে দীপ্রকে বলে গেল একদিন।

দীপ্র ঘুম ভেঙে উঠে বসে কথাটা কে বলল, ভাবছিল। কিন্তু আবছা মুখটা স্পষ্ট হচ্ছিল না কিছুতেই।

আমেরিকায় আসার আগেরদিন পর্যন্ত মুখটা স্পষ্ট হয়নি। তবু অস্পষ্টতাও তো একটা আভাস নিয়ে যায়। সেই আভাস থেকেই এয়ারপোর্ট থেকে সুচন্দ্রার নম্বরে একটা মেসেজ করল। মেসেজ করে জানাল যে ফেসবুকে সুচন্দ্রাকে একটা ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছে দীপ্র। সুচন্দ্রা অ্যাকসেপ্ট করলে কথা হবে।

চোখটা লেগে গিয়েছিল দীপ্রর। খুলে গেল বিমানসেবিকাদের চিৎকার চেঁচামেচিতে। আর সুচন্দ্রা ওর ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করার আগেই ব্রাসেলসের মাটি অ্যাকসেপ্ট করে নিল ওদের বিমানটাকে।

ব্রাসেলসের সিকিওরিটি চেক-এর সামনে দাঁড়িয়ে মা'কে ফোন করার সময় দীপ্রর ইচ্ছে হল সুচন্দ্রাকে ফোন করে একটা। কিন্তু অচেনা-অজানা মেয়ে, কী কথা বলবে তার সঙ্গে? তার চাইতে আগে ফেসবুকে বন্ধু হয়ে আসুক। আঠাহাজার মাইল, দশ হাজার মাইল দূর থেকে দানা বাঁধুক রিলেশনটা। ভাবতে ভাবতে ব্রাসেলসের কড়া নিরাপত্তার বেড়া টপকে নেওয়ার্কের বিমানে উঠে বসল দীপ্র। বসার আগে অবশ্য গোটা একটা ব্যাগেল উদরস্থ করল চিজের সাহায্যে। খুব নরম এই ব্যাগেলগুলো। কতটা নরম সেটা একমাত্র জিভে দিলেই বোঝা যায়। সেই স্বাদটাই মুখে ছিল কিন্তু আটলান্টিক পার হওয়ার সময় এয়ারহোস্টেসের দেওয়া বিয়ার খেয়ে ভিতরটা জ্বালা করে উঠল। এই জ্বালা সম্বল করেই তো এতদিন কাটিয়ে এল দীপ্র। এবার নিশ্চয়ই একটা নতুন পৃথিবী তার আলো দিয়ে ধুইয়ে দেবে সব?

নেওয়ার্কের ইমিগ্রেশন কাউন্টারটা পার হওয়ার সময় দীপ্রর হঠাৎ চোখ পড়ল, ডানদিকের একটা ছোট্ট হাফ-ঘেরা জায়গায় একটা লোক নিজের শার্ট খুলে রাখার পর, প্যান্টও খুলছে। ইনফ্যাক্ট ওর সামনে দাঁড়িয়ে খোলাচ্ছে ওকে একটা ভু-কাট চুলের অফিসার। সুটকেস নিতে এগিয়ে যাওয়ার সময় ভালো করে তাকাল দীপ্র লোকটার দিকে। হ্যাঁ, এই লোকটাই তো ওকে দিয়ে চকোলেট পাচার করাতে চাইছিল।

ভাগ্যিস দীপ্র নেয়নি। নিশ্চয়ই দু'নম্বরী কিছু ছিল ওই চকোলেটের মধ্যে। নইলে দীপ্রকে সসম্মানে মূল ভূখণ্ডে প্রবেশাধিকার দিল যে আমেরিকা সেই আবার ওই লোকটাকে উলঙ্গ করে কী বুঝে নিতে চাইছে?

একটু দাঁড়িয়ে গিয়ে আবার এগোনোর সময়ই পিছন থেকে চিৎকার কানে এল। দীপ্র ঘাড় ঘোরাতেই লোকটার সঙ্গে চোখাচুখি হয়ে গেল। লোকটা ওর দিকে আঙুল তুলে চেঁচিয়ে উঠল, আস্ক হিম। হি অলসো এট মাই চকোলেটস।

দীপ্র পা চালিয়ে সরে আসছিল। কিন্তু একটা আওয়াজ যেন ওর দিকেই ধেয়ে এল। 'হে ইউ'। মরেছে। কে ডাকছে ওকে? কেন ডাকছে?

(চলবে)

ওপাশে একটা মেয়ের গলা শুনেই বলে উঠেছিল, আমি কিন্তু এক্সপ্রেসিভ নই। আপনার শরীরের কোথাও কোনও ট্যাটু থাকলে সেখানে চুমু খেয়ে কোনও কবিতা বলতে পারব না। তারপরও বিয়ে করবেন আমাকে? ওপাশ থেকে মেয়েটা হো-হো করে হেসে উঠেছিল। আর দীপ্র রং নম্বর বুঝতে পেরে ফোনটা কেটে দিতে দিতে একটা নিঃশ্বাস ফেলেছিল।

boierpathshala.blogspot.com

পর্ব ৪

থাকে শুধু অন্ধকার

■ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

৭

অফিস থেকে বাড়ি ফিরে গুম হয়ে বসেছিল সুচন্দ্রা। মা দু'বার জিজ্ঞেস করে গেল, রাতে কী খাবে। কিন্তু, কোনও জবাব পেল না ওর থেকে। আসলে কোনও কিছু নিয়েই কথা বলতে ভালো লাগছিল না ওর। ইচ্ছে করছিল আলো নিভিয়ে চুপ করে শুয়ে থাকতে নিজের ওই ছোট্ট ঘরটায়। কিন্তু, শুলেও বিশ্রাম হবে বলে বিশ্বাস হচ্ছিল না। কারণ, মাথাটা দপদপ করছিল।

ওদের পুরনো বাড়িতে এক-একটা ঘর ছিল যেন এক-একটা হাওড়াখানা। লম্বায়-চওড়ায় বিশাল বিশাল সব। কড়িকাঠ থেকে মেঝে পর্যন্ত তিন মানুষ সমান উচ্চতা। আর মেঝেগুলো থেকে আসবাবপত্র সরিয়ে দিলে বাচ্চারা ফুটবল খেলতেও পারত। তুলনায় এই ফ্ল্যাটের দুটো বেডরুমই পায়রার খোপ। ওর ঘরটা তো একটু বেশি ছোট। একটা পড়ার টেবিল, বইয়ের র‍্যাক আর খাট রেখে সামান্য ফাঁকা জায়গাও নেই। হাঁটতে গেলে একটা কিছু গায়ে লেগে যায়।

—বিয়ের পর তুই আর তোর বর এলে আমাদের ঘরে থাকবি। আমি আর তোর বাবা এই ঘরটায় চলে আসব। মা একদিন বলেছিল।

লজ্জা পেয়ে গিয়েছিল সুচন্দ্রা। সামান্য চুপ করে থেকে বলেছিল, আমি মাকে বিয়ে করব সে যখন শ্বশুরবাড়ি আসবে এই ঘরেই থাকতে পারবে। আর যদি না পারে তাহলে তার আমাকে বিয়ে করারই দরকার নেই।

মা হেসে ফেলেছিল। কিন্তু সুচন্দ্রা সেই হাসির ভিতর অনেকটা কষ্টের ঝলক দেখতে পেয়েছিল। নিজের পৈতৃক ভিটে ছেড়ে চলে আসার যন্ত্রণা বাবা যে ভুলতে পারেনি তাও জানত। যে বাড়িতে জন্ম, শৈশব-কৈশোর যেখানে কেটেছে, সেই বাড়ি ছেড়ে চলে আসার সময় যন্ত্রণা হবে না? কিন্তু শুধু বাবার নয়, মায়েরও যে পাঁজর ভাঙছিল টের পেয়েছিল সুচন্দ্রা। খারাপ কি ওর নিজেরও লাগেনি? ওই বাড়ি যে ওরও হামাগুড়ি দিয়ে জীবনের জার্নি শুরু করার সাক্ষী। কিন্তু খারাপের পাশাপাশি ওর ভালো লেগেছিল, একটা মুক্তির কথা ভেবে। যে মুক্তি এই দু'-কামরার ফ্ল্যাটে আছে। আর সেই মুক্তি কেবলমাত্র আত্মীয়দের নিষ্ঠুরতা থেকেই নয়, স্মৃতির নেড়াজাল থেকেও।

ওই বাড়িরই একটা ঘরে সুচন্দ্রার দাদা সুতনু মারা গিয়েছিল টাইফয়েডে। চিকিৎসার গাফিলতি হয়েছিল কিংবা হতে পারে তখনও চিকিৎসাব্যবস্থা এত উন্নত ছিল না বলে আর কিছু করার ছিল না। কিন্তু ওর বাবা-মা'কে সে কথা কে বোঝাবে? কত রাত ঘুমোবার ভান করে পড়ে থেকে সুচন্দ্রা ওর বাবা-মা'কে কাঁদতে শুনেছে। সেই কান্নার ভিতরে শুধু নিজেদের বারো বছরের ছেলেকে হারানোর যন্ত্রণাই ছিল না, তাকে আরও বড় ডাক্তার কিংবা হাসপাতালে না নিয়ে যেতে পারার অপরাধবোধও ফিরে ফিরে আসত।

—সেদিন যদি তুমি ধর্মতলার ওই ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে চুন্টুকে তাহলে ভালো হত। তখন তো আর তোমার কোম্পানি বন্ধ হয়নি...

—টাকার কথা ভেবে আমি পিছিয়ে আসিনি সীমা। আসলে ডাক্তার দত্তকে ভরসা করেছিলাম। ভেবেছিলাম ওঁর কথামতো চললেই চুন্টু ঠিক সেরে যাবে...

—কেন বিশ্বাস করলে ওরকম অন্ধের মতো? কেন আর একটা কারও কাছে নিয়ে গেলে না?

—বিশ্বাস কি আমি একাই করেছিলাম? তুমি করনি? তখন সেকেন্ড ওপিনিয়ন নেওয়ার কথা তুমিও তো বলতে পারতে। বলেছিলে কি?

—না, বলিনি। সব দোষ আমারই ছিল। মেনে নিচ্ছি।

—দোষ নয় সীমা। বিশ্বাস জিনিসটাই এমন যে করলে অন্ধের মতোই করতে হয়। আমার ভাইদেরও কি সেভাবেই করিনি?

তারপর কথা থেমে যেত। শুধু ফোঁপানোর আওয়াজ আসত। কখনও একটা, কখনও বা দুটো গলা থেকেই।

ওই কান্না আর পারস্পরিক অভিযোগ থেকে বাবা-মা নিস্তার পাবে জেনে এই ফ্ল্যাটে আসার সময় খুশিই হয়েছিল সুচন্দ্রা। দাদার জন্য কষ্ট কি ওরও হত না? সেই যে প্রথমবার ইলেকট্রিক নাগরদোলায় উঠে ও চিৎকার করছিল আর দাদা ওকে জড়িয়ে ধরে বলছিল, 'কিচ্ছু হবে না বনু, আমি তো আছি' অথবা সেই সপ্তমীর দিন প্যান্টের ইলাস্টিক খুলে যাওয়া দাদা যেভাবে একহাতে প্যান্ট সামলে অন্যহাতে বোনের হাতধরে ঘুরেছিল চার-পাঁচটা প্যান্ডেল, সুচন্দ্রা কি কোনওদিন তা ভুলতে পারবে?

পারবে না। তবে না পারলেও সেই কুরে খাওয়া কষ্টটাকে মনের অনেক গভীরে চাপা দিয়েই পথ চলতে হবে, সেটা ও জেনে গিয়েছে। লোকের কাছে কষ্ট প্রকাশ করা মানে লোকের হাসির খোরাক হওয়া। কিন্তু, এই কথাটা মনে মনে জানলেও ও তো বাবা-মা, বিশেষ করে মাকে মুখের ওপর বলে কষ্ট দিতে পারে না। একতলার কিংবা তিনতলার ফ্ল্যাটের কেউ ওদের ঘরে এলে মা যখন দশটা কথার পর তাকে নিজের ছেলের কথা বলতে শুরু করে কিংবা ছেলের ছবির সামনে নিয়ে যায় তখন সুকন্যা মনে মনে বাধা দিতে চায় মা'কে। পরক্ষণেই বোঝে যে ঘটনা যেখানে ঘটেছিল সেখান থেকে দূরে চলে এলেই ঘটনা থেকে দূরে চলে আসা যায় না। শোক হয়তো কালের নিয়মে কিছুটা কমে কিন্তু স্মৃতি থাকে। থেকেই যায়।

অফিসের বস রমিত পাত্র যখন ওকে ডেকে ইউনিক সরষের তেলের বিজ্ঞাপনের কপি লিখতে বললেন, ও সে কারণেই চমকে গিয়েছিল।

—ইউনিক? মানে সেই তেলটা যেটা খেয়ে কুড়ি জনের ওপরে মারা গিয়েছিল। অন্ধ হয়েছিল পঞ্চাশের উপরে লোক। আরও না জানি কতজন পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল...

—হ্যাঁ, কিন্তু তাতে আমাদের কী? রমিত পাত্র বললেন।

—ওরা তো একেবারেই ব্ল্যাকলিস্টেড একটা সংস্থা। রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার সবাই ওদের নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে শুনেছি।

—দেখো সুচন্দ্রা, তোমাকে তো এখানে 'ইউনিক' সম্বন্ধে থিসিস লেখার জন্য ডাকা হয়নি আর তুমি তদন্ত রিপোর্ট লেখা পুলিশ অফিসার কিংবা জার্নালিস্টও নও।

—কিন্তু স্যার, এরকম খুনি কোম্পানির সঙ্গে কাজ করলে, আমাদের অর্গানাইজেশনের বদনাম

ওই কান্না আর পারস্পরিক অভিযোগ থেকে বাবা-মা নিস্তার পাবে জেনে এই ফ্ল্যাটে আসার সময় খুশিই হয়েছিল সুচন্দ্রা। দাদার জন্য কষ্ট কি ওরও হত না? সেই যে প্রথমবার ইলেকট্রিক নাগরদোলায় উঠে ও চিৎকার করছিল আর দাদা ওকে জড়িয়ে ধরে বলছিল, 'কিচ্ছু হবে না বনু, আমি তো আছি' অথবা সেই সপ্তমীর দিন প্যান্টের ইলাস্টিক খুলে যাওয়া দাদা যেভাবে একহাতে প্যান্ট সামলে অন্যহাতে বোনের হাতধরে ঘুরেছিল চার-পাঁচটা প্যান্ডেল, সুচন্দ্রা কি কোনওদিন তা ভুলতে পারবে? পারবে না। তবে না পারলেও সেই কুরে খাওয়া কষ্টটাকে মনের অনেক গভীরে চাপা দিয়েই পথ চলতে হবে, সেটা ও জেনে গিয়েছে। লোকের কাছে কষ্ট প্রকাশ করা মানে লোকের হাসির খোরাক হওয়া।

boierpathshala.blogspot.com

হবে না? মানুষের মধ্যেও তো ওদের সম্পর্কে ধারণা খুব খারাপ।

—ভুল করছ। ওদের সম্পর্কে নয়, ধারণা খারাপ, 'ইউনিক' নামটার বিষয়ে। মুম্বইতে মাফিয়ারা যখন জেল খেটে বেরোয় তখন কী করে জানো তো? সদ্যশিব যার নাম সে হয়ে যায় বিক্রম। ইউসুফ হয়ে যায় মকবুল। কিংবা অনেক সময় শয়নওয়াজ হয়ে যায় রবার্ট বা কৈলাশ। এবার এই নাম পালটানোর সঙ্গে-সঙ্গেই লোকটার গা থেকে সেভেনটি পারসেন্ট ব্যাগেজ খসে পড়ে। অন্য নাম মানেই অন্য পরিচয়। কে আর খুঁচিয়ে বের করার ধৈর্য রাখে ও আগে কী ছিল, কী করেছিল।

—ইউনিক কি নাম পালটে মার্কেটে আসতে চাইছে?

—এগজ্যাক্টলি। মালিক এক থাকবে, সেট-আপ মোর আর লেস একই থাকবে, প্রোডাক্ট একই থাকবে, চাই কি প্রোডাক্টের ভিতরের তেজালটাও একই থাকবে। বদলে যাবে শুধু অফিস অ্যাড্রেস আর তেলটার নাম। রমিত জোরে হেসে উঠলেন।

সেই হাসির শব্দটা বুলেটের মতো সুচন্দ্রাকে এসে বিঁধতে থাকল। কতগুলো খুনি যারা সরষের তেলে নিকৃষ্ট কিছু মিশিয়ে এত লোককে মেরেছে তাদের ইতিহাসটা মুছে দেওয়ার কাজ নিয়েছে ওর সংস্থা। যেন নতুন জামা পরিয়ে দিলেই পুরনো সমস্ত অপরাধ ধুয়ে যাবে।

—প্রাথমিক একটা খসড়া খুব তাড়াতাড়ি তৈরি করে ওদের কাছে পাঠাতে হবে, বুঝলে? তুমি দেরি না করে কাজে লেগে পড়। এখন ওরা চাপে আছে এটাই সময় ওদের যতটা পারা যায় এক্সপ্লয়েট করার। রমিত বললেন।

সভ্যতার প্রাথমিক শর্তটাই কি শোষণ? যে যাকে পারবে, যতটা পারবে, শোষণ করবে? সুচন্দ্রার ইচ্ছে হল তৎক্ষণাৎ চাকরিটা ছেড়ে দেয় কিন্তু এই পৃথিবীতে একজন সাধারণ মানুষ কতবারই বা নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী চলতে পারে?

তাই অসম্ভব একটা মনখারাপ নিয়ে প্রথমে নিজের কিউবিকলে আর তারপর বাড়িতে ফিরল। একা ঘরে শুয়ে ফেসবুকে দীপ্রর ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পেয়ে হঠাৎই মন চনমনে হয়ে উঠল ও। তখনই অ্যাকসেপ্ট না-করে ও ওই 'কনফার্ম' শব্দটার দিকে তাকিয়ে রইল মোবাইলে। ভাবতে থাকল, দীপ্র কবে কনফার্ম করবে ওদের সম্পর্ক? আদৌ কি করবে? মা মাঝে মাঝে কীসব যেন বিড়বিড় করে। সুচন্দ্রা একদিন কান পেতে শুনে দেখেছে, মায়ের মনের ইচ্ছা হল, যে ছেলেকে হারিয়েছে সেই ছেলেকে আবার জামাইয়ের ভিতর দিয়ে ফিরে পাবে। সেরকম কোনও ছেলে কি আসবে সুচন্দ্রার জীবনে? সেটা কি দীপ্রই হবে?

ফেসবুকে দীপ্রর ছবিগুলো দেখতে দেখতে সুচন্দ্রার মনে পড়ছিল ওর বসের সেই কথা যে পরিচয় পালটে নিলেই ইতিহাসটা পালটে যায়। সুচন্দ্রা যদি পারত তাহলে এক্ষুনি ওর পরিচয় পালটে 'সিঙ্গল' থেকে 'ম্যারেড' হয়ে যেত। ভারতের নাগরিক থেকে এনআরআই হয়ে যেত, ওই অ্যাড এজেন্সির কর্মী থেকে দীপ্রর বউ হয়ে যেত। কিন্তু কিছুতেই খুনিদের ক্লিনচিট দিয়ে নতুন বিজ্ঞাপনের কপি লিখত না। কিছুতেই না।

সুজির লোভাও বানিয়ে মা ঘরে ঢুকল। ফেসবুক থেকে লগ-আউট হতে হতে সুচন্দ্রার হঠাৎ মনে হল, মুছে ফেলতে হবে এমন অতীত কি পৃথিবীতে সবার থাকে? দীপ্ররও আছে?

৮

আমেরিকা কি শুধু নিউ-ইয়র্ক কিংবা লস-অ্যাঞ্জেলেস? হতে পারে সেখানে হইহল্লা অনেক বেশি। পৃথিবীর বেশিরভাগ লোক ওসব জায়গাকেই আমেরিকা বলে ভাবে। টাইমস স্কোয়ার কিংবা বেভারলি হিলস'-এর নাম যতবার দেশ-বিদেশের খবরের কাগজে বেরোয় তার কুড়িভাগের একভাগও অন্যান্য জায়গার কপালে জোটে না। কিন্তু তাই বলে আমেরিকা মানেই ওরা নয়। আসল আমেরিকা প্রশান্ত মহাসাগর বা আটলান্টিকের পাড়ে নয়, আসল আমেরিকাকে খুঁজে পেতে হলে দেশটার ভিতরে ঢুকতে হবে, গভীরে যেতে হবে।

—ইস্ট কোস্ট বা ওয়েস্ট কোস্ট নয়, আমেরিকাকে অনুভব করতে হলে তোমাকে মিড ওয়েস্টে থাকতেই হবে। শীত-গ্রীষ্মের তীক্ষ্ণতা, নদী-জঙ্গল-পাহাড়, সব পাবে তুমি ওখানে। আর পাবে মাইলের পর মাইল ভুট্টাক্ষেত। আমেরিকা যে কৃষির দৌলতেই জগতে প্রথম শক্তির জায়গাটা কব্জা করেছিল, ওটা আমরা ভুলে যাই আজকাল। কিন্তু তুমি যেখানে যাচ্ছ সেখানে দেখবে কত বিরাট বিরাট ফার্মহাউজ, চাষবাসের কী ঘটা। জানো, আমেরিকার চাষিরাও আমাদের মতোই পাঁজি-পুথি মেনে বীজবপন করে, ফসল তোলে। ওদের অ্যালমানাক আর আমাদের পঞ্জিকা হবে সরে প্রায় একই জিনিস, আমি ওই মিড ওয়েস্টে গিয়েই টের পেয়েছিলাম।

অঞ্জনবাবু মনের আনন্দে বলে যাচ্ছিলেন। কিন্তু, শুনতে শুনতে দীপ্র ভাবছিল, স্যার তো ছিলেন বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ে, ক্যালিফোর্নিয়ায়। মাঝে মাঝে ছুটিছাটায় গিয়েছেন হয়তো ওখানে আর আমাকে যে ওই অকাঁড়া আমেরিকায় গিয়ে থাকতে হবে— মাসের পর মাস, বছরের পর বছর।

—একদমই বাঙালি নেই বোধহয় ওদিকটায়? দীপ্র জিজ্ঞেস করল একসময়।

—আমি যখন গিয়েছি, তখন তো একেবারেই ছিল না। এখন হয়তো কয়েকঘর পেতেও পারো। তবে সাধারণত ইলিনয় পেরোলেই আর বাঙালির দেখা মেলে না। কিন্তু সে তো একপ্রকার ভালোই। বাঙালি থাকলেই তার সঙ্গে দলাদলি, বাজে তর্ক, পরনিন্দা-পরচর্চা চলে আসবে। উলটোদিকে তুমি যে পরিবেশ পাবে তাতে দিনরাত গবেষণায় ডুবে থাকতে পারবে। ডিস্টার্ব করার মতো কিছু পাবে না কোথাও।

দীপ্র ভাবছিল বলবে যে বাঙালি যদি এতই খারাপ তাহলে আপনি বাড়িতে পুজোর আয়োজন করে গুচ্ছের বাঙালি ছাত্রছাত্রী ডেকে আনেন কেন, সপ্তমী-অষ্টমী-নবমীতে? বলল না কারণ, স্যারকে হার্ট করার কোনও ইচ্ছে ওর ছিল না। আর দ্বিতীয়ত ও বুঝতে পারছিল যে স্যার যা বলছেন তার সবটাই ওকে মনের জোর দেওয়ার জন্য। নইলে বাঙালি কেন, বিশ্বের কারও ওপরেই এই আত্মভোলা মানুষটার তত কিছু রাগ নেই।

অঞ্জনবাবু উঠে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে দীপ্রর দিকে একটা মিষ্টির প্লেট এগিয়ে দিয়ে বললেন, আমার হেল্পিং হ্যান্ড দিন দুয়েকের জন্য দেশের বাড়ি গিয়েছে...

দীপ্র রীতিমতো অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল, তাই বলে স্যার আপনি নিজে উঠে...

—তাতে কী? দেখো, আমেরিকায় তো সব কাজ নিজের হাতেই করতে হয় সবাইকে, কিন্তু ভারতে ফিরেই আমরা আবার কেমন বাবু হয়ে যাই। এই অভ্যাসটা ঠিক নয়।

দীপ্র একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল শুনতে শুনতে। ভিতরে, গরম জামাকাপড় নেই, খাবার নেই, সিমলে পাড়ার নরেন্দ্রনাথ কীভাবে প্রতিষ্ঠা করলেন তাও নিজের দেশ, নিজের ধর্ম, নিজের সংস্কৃতিকে? এ কেবল আধ্যাত্মিকতার গল্প নয়, মানুষের অন্তঃস্থলে লুকিয়ে থাকা সাহস আর সম্ভাবনার গল্প। সেই গল্পটাকে তোমাকেও সত্যি করে তুলতে হবে। আর আমি জানি তুমি পারবে।

আমেরিকার ডোমেস্টিক ফ্লাইটগুলো খুবই ছোট। মানুষের নড়াচড়া করাই দায়। লিনাকীনা ওকে বলেছিল একবার কথাটা। কিন্তু, তখন দীপ্রর ওসব বোঝার মতো অবস্থা নাকি? আর তাছাড়া অচেনা জঙ্গলকে মানুষ ভয়ও পায় না। কিন্তু এখন যখন দীপ্র আমেরিকার মেইনল্যান্ডে ঢুকে পড়েছে, এখন যখন দীপ্র সেই রাজ্যে যাচ্ছে যার পূর্ব সীমান্তে মস্ত মিসিসিপি আর পশ্চিমে মিসৌরি নদী, যার ফসলক্ষেতের উর্বরতা সারা পৃথিবীর কৌতূহলের বিষয়, তখন সেখান থেকে কোথাও আসা-যাওয়ার প্লেনগুলো কীরকম তাও ওর ভাবনাতে আসবেই।

একা ঘরে শুয়ে ফেসবুকে দীপ্রর ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পেয়ে হঠাৎই মন চনমনে হয়ে উঠল ও। তখনই অ্যাকসেপ্ট না-করে ও ওই 'কনফার্ম' শব্দটার দিকে তাকিয়ে রইল মোবাইলে। ভাবতে থাকল, দীপ্র কবে কনফার্ম করবে ওদের সম্পর্ক? আদৌ কি করবে? মা মাঝে মাঝে কীসব যেন বিড়বিড় করে। সুচন্দ্রা একদিন কান পেতে শুনে দেখেছে, মায়ের মনের ইচ্ছা হল, যে ছেলেকে হারিয়েছে সেই ছেলেকে আবার জামাইয়ের ভিতর দিয়ে ফিরে পাবে। সেরকম কোনও ছেলে কি আসবে সুচন্দ্রার জীবনে? সেটা কি দীপ্রই হবে?

স্যারের কথাগুলো থেকে ও জোর পেয়েছিল অনেকটা। আজ নেওয়ার্কে নামার পর যখন ওই পুলিশ অফিসার ওকে পিছু ডেকে জিজ্ঞেস করছিল ওর ওই প্রাক্তন সহযাত্রীর সম্পর্কে তখন দীপ্র লজ্জার জন্য একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু চোখ বন্ধ করে স্বামীজির পাগড়ি পরা ছবিটার কথা কল্পনা করতেই দীপ্র কেমন একটা সাহস পেল মনে। খুব শান্ত অথচ দৃঢ় গলায় জানিয়ে দিল যে ওই লোকটাকে ও চেনেও না।

—আমি প্লেনে তোমায় চকোলেট অফার করিনি? ওই খালি গা, আন্ডারওয়্যার পরা লোকটা চেঁচিয়ে উঠল।

—এয়ারহোস্টেসরা আমায় যা খেতে দিয়েছিল, আমি শুধু তাই খেয়েছি।

দীপ্রর কথা শেষ হওয়ার আগেই লোকটার কাঁধে হাত রাখা অফিসার ওর দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, সরি ফর দ্য ইনকনভিনিয়েন্স। ইউ মে গো নাও। অ্যান্ড বেস্ট অফ লাক।

তিন ঘণ্টা এয়ারপোর্টে বসে যখন ডি-ময়েন'এর প্লেনে উঠে বসেছে দীপ্র তখন একবার ওর অস্বস্তি হল, ঘটনাটার কথা ভেবে। পরক্ষণে একটা স্বস্তিও পেল এটা মনে করে যে আমেরিকায় অযথা হ্যারাস করা হয় না কাউকে। নইলে ওই অফিসার ওকে দু'মিনিটের মধ্যেই এগিয়ে যেতে বলতেন না।

ডি-ময়েন থেকে অ্যামেস চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার। অবশ্য এখানে তো সব হিসেবই মাইলে। তা ওই তিরিশ মাইল যাওয়ার জন্য কোনও না কোনও যানবাহন নিশ্চয়ই থাকবে এয়ারপোর্টে। এখানে জনসংখ্যা কম, অল্প লোক চড়ে বলে অন্তর্দেশীয় প্লেনগুলো ছোট হতে পারে কিন্তু রাস্তাগুলো তো চওড়া। কতক্ষণই বা লাগবে ওর ইউনিভার্সিটির শহরে পৌঁছতে?

মিসিসিপি আর ডি-ময়েন নদীর সংযোগস্থলে ফোর্ট ডি-ময়েন তৈরি হয়েছিল ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে। সেই দুটি এখন এই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় শহর। অ্যামেসের লোকেরা তাদের বড়সড় সওদা করার থাকলেও ডি-ময়েনে চলে আসে। দীপ্রকে ই-মেলে লিখেছিলেন ওর রিসার্চ গাইড। কিন্তু দীপ্র তো এখানে সওদা করতে আসেনি, তাই ডি-ময়েনে বেশি আসার দরকার পড়বে না ওর। লাগেজ নিয়ে বাইরে বেরিয়ে শাটল ট্যাক্সির কুপন কাটছে হঠাৎ সামান্য শ্যামলা এবং চূড়ান্ত অ্যাট্রাকটিভ এক মহিলাকে মোবাইলে বাংলায় কথা বলতে বলতে এগিয়ে যেতে দেখল দীপ্র। বাঙালি? ডি-ময়েনে বাঙালি? নিজের ভিতরকার সমস্ত দ্বিধা কাটিয়ে দীপ্র ডেকে উঠল— শুনছেন?

(চলবে)

boierpathshala.blogspot.com

থাকে শুধু অন্ধকার

■ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

ছোট থেকেই বৃষ্টি ভীষণ ভালোবাসত মধুরা। কিন্তু ভালোবাসলে হবে কী, ওদের এই এঁদো গলি আর ভাঙাচোরা পাড়ায় বৃষ্টি ছিল একটা অভিশাপ। এক ঘণ্টা-দেড় ঘণ্টা বৃষ্টি হল কি হল না, হাঁটুজল জমে গেল। আর সেই জলে মহেঞ্জোদড়োর যুগ থেকে ব্রিটিশ আমলের নোংরা পর্যন্ত ভেসে বেড়াত। মরা কুকুর-বিড়াল থেকে জ্যান্ত বেজি, সবাইকে ও ভাসতে দেখেছে ওই জলে। তার ভিতর দিয়ে বাড়ি ফিরলে তিনবার স্নান করেও তৃপ্তি হবে না মানুষের, কিন্তু ওদের অন্ধকার কলঘরের চৌবাচ্চায় একবার স্নান করার মতো জলই কি থাকত সবসময়?

এলাকার কাউন্সিলরের কাছে জল নামছে না কেন তাই নিয়ে ডেপুটেশন দিতে মধুরাও গিয়েছে কয়েকবার। গিয়ে মুখ দেখেছে। ভদ্রলোক পান চিবোতে চিবোতে বলতেন যে, নাগরিকদের দোষেই ঘোটা অঞ্চল জলমগ্ন হয়ে থাকে। তারা কেন প্লাস্টিক ফেলে যত্রতত্র? সেই প্লাস্টিক গিয়ে নালার মুখ বুজিয়ে দেয় বলেই জল নামে না দু'দিন-তিনদিন আর ঘোটা অঞ্চলটা একটা নরকের চেহারা নেয়।

আমার সামনে এসে কাজ হবে না, আয়নার সামনে দাঁড়ান, তাহলেই বুঝতে পারবেন কার দোষে এই অবস্থা। ঝাঁঝিয়ে উঠতেন কাউন্সিলর।

আশ্চর্য যে তারপরও উনি ভোটে জিততেন প্রতি পাঁচ বছর অন্তর। কারণ অঙ্কের মাস্টারমশাই হিসেবে বিরাট পসার ছিল ভদ্রলোকের। ভোটের সময় এলে ওঁর বাঁধা বুলিই ছিল, 'আমি না জিতলে আর কেউ ভোটার পাবে না আছে, এইটুকু মনে রাখবেন'। কী আশ্চর্য ওই একটা ধমকিতেই কাজ হত। ঘরে-ঘরে এইট-নাইন-টেন-এর ছেলেমেয়ে, দু'বছর-তিনবছর কিংবা সামনের বছরই মাধ্যমিক। কেউ তাই চটাতে চাইত না ছানীয় রাজমোহন হাইস্কুলের আবাশছোঁয়া খ্যাতিসম্পন্ন অঙ্কের স্যার বিনয় পালকে।

ওঁর কাছে প্রাইভেটে পড়তে গেলেই উনি আগে খোঁজ নিতেন, ছেলেটি বা মেয়েটির পরিবার ভোট দিয়েছে কাদের। যদি দেখা যেত যে, তারা ওঁকে ভোট দেয়নি তাহলে তাদের রাত্রি নটা কিংবা দশটার ব্যাচে জায়গা হত কিংবা হতও না অনেকসময়। সে কারণেই সকাল সাতটা থেকে বেলা দশটা, আবার বিকেল ছটা থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত এক ঘণ্টা-দেড় ঘণ্টার ব্যাচে শয়ে শয়ে স্টুডেন্ট পড়ানো বিনয়বাবুকে কেউ চটাতে চাইত না সহজে।

ওই পড়ানোর মধ্যে-মধ্যেই মানুষের কথাবার্তা, অভাব-অভিযোগের কথাও শুনতেন বিনয়বাবু, ওদেরই যেমন শুনেছিলেন। কিন্তু ওঁর জনসংযোগ ছিল টিউশনি। সেই টিউশনির রমরমাতেই ওঁর দুটো বাড়ি, অ্যামবাসাডর গাড়ি। কিন্তু, বিনয়বাবু এমন একটা পরদা ঝুলিয়ে রাখতেন সামনে যাতে কমবেশি অনেকেই বিশ্বাস করত, পয়সা নিলেও, উনি মূলত জনসেবার জন্যই টিউশনিটা করেন।

ওঁর কাছ থেকেই মধুরা শিখেছিল যে নিজের প্রয়োজনটা এমনভাবে সামনে আনতে হয় যাতে মনে হয়, নিজের ছাড়া পৃথিবীর সকলের প্রয়োজন ওটা। সেই শেখাটাকে কাজে লাগিয়ে মধুরা একবার একটা ছেলের ঘাড় ভেঙে সিনেমা দেখেছিল, হোটেলে খেয়েছিল, ভিক্টোরিয়াতেও গিয়েছিল। আর সেই যাওয়া এবং খাওয়ার মধ্যে ছেলেটাকে বারবার মনে করিয়ে দিয়েছিল যে ছেলেটার মনে কষ্ট দিতে চাইছে না বলেই ও নিজের কাজ মুলতুবি রেখে এইসব জায়গায় যাচ্ছে।

খানিকটা বোকা ছিল বলে, আর খানিকটা মধুরার প্রেমে পড়েছিল বলেই হয়তো, সুদীপ নামের সেই ছেলেটা, মেনে নিয়েছিল মধুরার কথা। আর ভিক্টোরিয়ার সামনে তুমুল বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে মধুরা জেনেছিল, মেয়েদের জন্ম আসলে পরি হওয়ার জন্যই, কেবলমাত্র ভাগ্যের দোষে কাউকে কাউকে ঘুঁটে-কুড়ুনি হয়ে থেকে যেতে হয়। না, ঘুঁটে-কুড়ুনি হয়ে বাঁচবে বলে জন্মায়নি মধুরা। তাই নামের পাশাপাশি নিজের ভাগ্যও পালটে নিয়েছে। কিন্তু ভাগ্য এমন একটা জিনিস যে পালটাতেই থাকে ক্রমাগত, খারাপ থেকে ভালো নয়তো ভালো থেকে খারাপের দিকে। আর ভালো অবস্থা এলেই যারা ঢিল দেয় তাদের ভাগ্যে দ্রুতগতিতে আছড়ে পড়ে খারাপটা। মধুরা তো ঢিল দেওয়ার মেয়ে নয়। একবার একটা সিনেমায় ও দেখেছিল, সম্রাট নেপোলিয়ন যুদ্ধ চলাকালীন ঘোড়ার পিঠেই ঘুমোতেন। খুব ভালো লেগেছিল। মনে হয়েছিল, জীবনের সঙ্গে যুদ্ধ আর যুদ্ধের সঙ্গে জীবনকে এভাবেই মিলিয়ে নিতে হয়। নইলে হেরে যেতে হয়।

কিন্তু হেরে কি নেপোলিয়নও যাননি? নিজের সাম্রাজ্য ছেড়ে সেন্ট হেলেনা না দ্বীপে নির্বাসনে যেতে হয়নি তাঁকে? কী মনে হচ্ছিল তখন তাঁর? ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র?

না, মধুরা ভাগ্যকে জিততে দেবে না। যে ঝঞ্ঝাট এসেছে, সেটা কয়েকদিনের। প্লাস্টিক নালার মুখে আটকে গেলে যেমন জল জমে যায় আর চারদিক থইথই করে, তেমনই একটা কিছু চলছে এখন। কিন্তু নালার মুখ আর প্লাস্টিক এই দুটো খুঁজে পেয়ে একটার থেকে আর একটাকে সরিয়ে দিতে পারলেই, জল জমে থাকবে না আর। নেমে যাবে। আর সেই খোঁজটা মধুরাকেই করতে হবে। শান্তনু নিশ্চয়ই সাহায্য করবে ওকে, লড়াইটা তো শান্তনুরও। কিন্তু মধুরা দেখেছে ও একটা রাস্তা বাতলে দিলে শান্তনু যত সহজে সেটা ধরে ছুটতে পারে, নিজে রাস্তা খুঁজে বের করতে পারে না তত সহজে। দরকার নেই। সবাইকে দিয়ে সব কাজ হয় নাকি?

আমেরিকার বৃষ্টি আমেরিকার মতোই। হবে, থামবে, হবে। ওই সারাদিন ধরে টিপটিপ কিংবা মুষলধারে দু'-তিনঘণ্টা। হতে পারে মিড ওয়েস্ট বলে ব্যাপারটা এরকম, ইস্ট বা ওয়েস্ট কোস্টে বৃষ্টির চরিত্র অন্যরকম। তবু যেটুকু যা শুনেছে বা ওদিকে গিয়েছে যখন দেখেছে তাতে মনে হয়েছে আমেরিকার আর সবকিছুর মতো বৃষ্টিও প্রফেশনাল। তার আবেগতাড়িত হওয়ার কোনও কোল নেই। সে আবহটা তীব্রতার সঙ্গে ঝরবে তারপর থেমে যাবে। তারপর আবার...

আজ সকাল থেকেও দু'বার বৃষ্টি হয়েছে। তারমধ্যেই শান্তনুকে ফোনে তুলে দিতে এসেছিল মধুরা। দেখা যাক, নিউ ইয়র্কে যে কাজে যাচ্ছে তাতে ওদের অবস্থার কিছু পরিবর্তন হয় নাকি। শান্তনু সিকিওরিটি চেকের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পর ফিরতি পথে লোকটাকে চোখে পড়ল মধুরার। লোক

মধুরা জেনেছিল, মেয়েদের জন্ম আসলে পরি হওয়ার জন্যই, কেবলমাত্র ভাগ্যের দোষে কাউকে কাউকে ঘুঁটে-কুড়ুনি হয়ে থেকে যেতে হয়। না, ঘুঁটে-কুড়ুনি হয়ে বাঁচবে বলে জন্মায়নি মধুরা। তাই নামের পাশাপাশি নিজের ভাগ্যও পালটে নিয়েছে। কিন্তু ভাগ্য এমন একটা জিনিস যে পালটাতেই থাকে ক্রমাগত, খারাপ থেকে ভালো নয়তো ভালো থেকে খারাপের দিকে। আর ভালো অবস্থা এলেই যারা ঢিল দেয় তাদের ভাগ্যে দ্রুতগতিতে আছড়ে পড়ে খারাপটা। মধুরা তো ঢিল দেওয়ার মেয়ে নয়। একবার একটা সিনেমায় ও দেখেছিল, সম্রাট নেপোলিয়ন যুদ্ধ চলাকালীন ঘোড়ার পিঠেই ঘুমোতেন। খুব ভালো লেগেছিল। মনে হয়েছিল, জীবনের সঙ্গে যুদ্ধ আর যুদ্ধের সঙ্গে জীবনকে এভাবেই মিলিয়ে নিতে হয়। নইলে হেরে যেতে হয়।

boierpathshala.blogspot.com

নয় ছেলেই। তত কিছু গুরুত্ব না দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু হঠাৎ করে দূর থেকেই হালকা ভেসে এল সেই গানটার সুর। সেই গান। আট-দশবছর আগে যেটা শুনলেই মন আনচান করে উঠত ওর। 'ও দয়াল বিচার করো, ও দয়াল বিচার করো দাও না তারে ফাঁসি...' গুনগুন করছিল ছেলেটা।

আশ্চর্য! জি-ময়োনে কাকে ফাঁসি দিতে এসেছে ও? নাকি নিজেই গলায় পরতে চাইছে, ফাঁস। তাহলে তো ওর সঙ্গে আলাপ করা দরকার মধুরার। কিন্তু, যেচে আলাপ করলে জাঁভাবে নেবে ভেবে মধুরা এমনিই ফোনটা তুলে কথা বলতে শুরু করল, হাওয়ার সঙ্গে। বাংলায়।

গুজরাতি বা তামিল হলে চালটা না খাটতেও পারত। কিন্তু বাঙালি তো। নির্বান্ধব জায়গায় 'বাংলা' শুনলে সে একবার বাংলা বলে উঠবেই। ছেলেটাও পিছন থেকে ডেকে উঠল ওকে। মধুরা প্রথমে কিছু শুনতে পায়নি এমনভাবে এগিয়ে গেল। কিন্তু ছেলেটা নির্ঘাত আমেরিকায় নতুন। নইলে জানত যে সাড়া না পেলে এখানে কেউ দ্বিতীয়বার ডাকে না।

বেরোনোর গেটের ঠিক আগে পিছন ফিরল মধুরা। ওর সেই মানুষ বধ করা হাসিটা হেসে একটু গলা তুলে বাংলায় বলল, আমাকে ডাকছেন আপনি?

ছেলেটা দ্রুত এগিয়ে আসতে থাকল ওর দিকে। মধুরার একবার মনে হল, সৌভাগ্য এগিয়ে আসছে। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে নিজেই ধমক দিল ও। অতটা কেন বাবছে? মারিয়াম ভাবতে পারে, আটকে থাকা প্লাস্টিকটা দেখতে পেয়েছে। এবার সেটাকে ওদিক থেকে এদিক সরাতে পারলেই জল নেমে যাবে আবার। আর বৃষ্টি কোনও ভয় নিয়ে আসবে না।

ছেলেটা যখন প্রায় সামনে তখন একবার দরজার দিকে তাকাল মধুরা। বাইরে মনে হয় বৃষ্টি নেমেছে, আবার।

১০

লোকটার নাম রবার্ট। ভয়ঙ্কর বদমেজাজী লোকটা। বিরাট একটা চাকরির লাপটে এর মাথা কাটে, ওকে খুলে চড়ায়। কিন্তু হারায় নিজের স্ত্রীকে। অত খারাপ কথা সহ্য করে কোন মহিলা থাকবে? ওর স্ত্রীও থাকেনি। ডিভোর্স দিয়ে কেটে পড়েছে। আর সেই বিচ্ছেদের পরপরই লোকটার একটা বড় হার্ট অ্যাটাক হয়। খানিকটা ঘাবড়ে যায় লোকটা। টাকাপয়সা তো অনেকই কামিয়েছে তাই ডাক্তারের কথামতো চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে একটা আধা-গ্রামে বড় বাড়ি কিনে রিটায়ার করে যায়। বাড়িটার সামনে বেশ অনেকটা জায়গা, ফার্মিং বা বাগান করার জন্য। আর সবচেয়ে যেটা সুন্দর তা হল ওই বাগানের পরই সরু একটা রাস্তা আর তার পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে চমৎকার একটা তিরতিরে নদী।

লোকটা একজনকে কাজে বহাল করে ওই বাগান ইত্যাদি দেখভাল করার জন্য। সেই বান্দার নাম অ্যান্ডি। অ্যান্ডিকে নিজের খাস চাকরই মনে করে রবার্ট। আর এটা দেখে খুশি হয় যে অ্যান্ডির তাতে কোনও অসুবিধাই নেই। মাঝেমাঝে একটু এক্সট্রা টাকা পেলেই যারপরনাই খুশি অ্যান্ডি, সব হুকুম তামিল করতে প্রস্তুত।

দিন ভালোই কাটছিল রবার্টের। বাদ সাধল ওই ছোট্ট নদী। ওখানে মাছ ধরার ইচ্ছে হল ওর। কিন্তু ধরার আয়োজন করতে গিয়ে জানল যে নদীটা ওর প্রতিবেশী মার্ক-এর সম্পত্তির আশ। একটু বিরক্ত হয়েই মার্কের কাছে অনুমতি চাইতে গেল লোকটা। জীবনের বেশিরভাগটাই যে হুকুম দিয়ে কাটিয়েছে, শুনে নয়, তার পক্ষে কাজটা একটু কঠিনই কিন্তু রবার্ট ভেবেছিল মাসে পাঁচ হাজার ডলার অফার করলে মার্ক শুধু মাছ কেন, ওই ছোট্ট নদীতে তিমি মাছ যদি ভেসে আসে বাই-চান্স, সেটাও ধরতে দেবে।

রবার্টকে যৎপরোনাস্তি অবাক করে মার্ক অনুমতি দিল না। টাকার অঙ্কটা পাঁচ থেকে দশ হাজার ডলার করেও রাবর্ট অনুমতি পেল না। শুধু, রবার্ট যে ক'দিন বাঁচবে সেই ক'দিনই ওর মাছ ধরার অধিকার থাকবে নদীতে, ওর পরে ওর পরিবারের আর কেউ এই অধিকার দাবি করতে পারবে না, ইত্যাদি অনেক কথা বলেও রবার্ট মার্ককে রাজি করাতে পারল না। মার্কের সাফ কথা, পারিবারিক সম্পত্তিতে তারা কাউকে অ্যালাও করে না। অতএব...

তেতো মুখে ফিরে এল রবার্ট। এবং হতাশটা

দীপ্র চুপ করে রইল। কারণ, গাম্বাট হলেও লোকগুলোকে ভালোই লাগে ওর। অকারণে এরা কাঠি করে না কারও পিছনে, নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে। আরও যেটা ভালো সেটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটির ডিনকে ইউনিভার্সিটির টয়লেট পরিষ্কার করা লোকটা, বিকেল পাঁচটার পর 'হাই বব' বলে ডাকতে পারে। আর যাকে ডাকা হল সেও হাসিমুখেই, 'হাই চার্লস' বলে উত্তর দেবে। কেউ কারও চাকর বা মালিক নয়।

ভয়ংকর রাগে পরিণত হল কয়েক ঘণ্টার ভিতরেই। নিজেকে কী মনে করে ওই মার্ক নামের লোকটা? রবার্টকে চেনে ও? ওই নদীতে আজ নয় কাল মাছ ধরেই ছাড়বে রবার্ট। আর মার্ক জাঁভাবে আটকায়, সেটাও দেখে নেবে।

কিন্তু রবার্ট মাছ ধরার আগেই ছাদের কলেজে পড়তে যাওয়া রবার্টের মেয়ে সিন্থিয়া একদিন তিনটে মাছ হাতে নিয়ে বাড়িতে ঢোকে।

একমাত্র মেয়ে, ওর ডিভোর্সের সময় যাকে প্যারিসে পাঠিয়ে দিয়েছিল রবার্ট, সে ক'দিনের ছুটি কাটাতে এসে কার না ভাল লাগে? রবার্টেরও লেগেছিল। মেয়ের সঙ্গে গল্পগুজব হচ্ছিল খুব। কিন্তু মেয়ের হাতে মাছ দেখে, মাথা খারাপ হয়ে যায় রবার্টের। ওর মনে হতে থাকে সিন্থিয়া বোধহয় কাউকে কিছু না জানিয়ে ওই মাছগুলো ধরেছে আর জানতে পারলে একটু পরেই মার্ক আসবে আইনি ঝামেলা করতে। সমস্ত ঝামেলা ফেস করার জন্য রবার্ট প্রস্তুত কিন্তু সিন্থিয়াকে ওতে জড়াতে দিতে চায় না রবার্ট। মেয়েটাকে প্যারিসে ফিরতে হবে তো।

সিন্থিয়া অবশ্য আর প্যারিসে ফেরে না। কারণ মার্কের ছেলে জো'র সঙ্গে মাখামাখি প্রেম আরম্ভ হয় তার। ব্যাপারটার সামান্য আঁচ অ্যান্ডি মারফত পেয়ে অগ্নিশর্মা হয়ে সিন্থিয়াকে তীব্র তিরস্কার করে রবার্ট। সিন্থিয়া চুপ করে শোনে। আর সাতদিনের ভিতরে জো'র সঙ্গে বস্টন পালিয়ে গিয়ে ফোন করে বাবাকে জানায় যে তারা দু'জন বিয়ে করেছে এবং রবার্ট যেন খুশি মনে মেনে নেয় ব্যাপারটা।

রবার্টের মাথা দপদপ করতে থাকে। ওর খালি মনে হয় যে ও পুরোপুরি হেরে গিয়েছে। মার্কের নদী থেকে ও মাছ ধরতে পারেনি কিন্তু ওর জীবন থেকে মার্ক নিজের ছেলে জো'কে দিয়ে মাছের মতোই খলবলে সিন্থিয়াকে তুলে নিয়ে গিয়েছে। প্রতিশোধ স্পৃহায় উন্মত্ত রবার্ট, অ্যান্ডিকে একটা কাজ দিয়ে সামনের শহরে পাঠায় আর মার্ককে কফি খেতে ডাকে নিজের বাড়িতে। যেহেতু ওরা এখন দুই বোয়াই তাই মার্ক সানন্দেই রবার্টের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে ওর বাড়িতে আসে এবং তারপরই রবার্ট নিজের বন্দুকের বাঁট ওর মাথায় বসিয়ে দেয় পিছন থেকে। একবার, দু'বার তিনবার।

মরে যায় মার্ক। আর রবার্ট ওর মৃতদেহটা নদীতে ভাসিয়ে দেবে ভেবেও ভাসায় না। নিজের বাগানে যে কাকতাড়ুয়াটা দাঁড়িয়ে আছে তার শার্ট আর টুপি খুলে মৃত মার্ককে পরিয়ে দেয়। তারপর ওকেই দাঁড় করিয়ে দেয় কাকতাড়ুয়া হিসেবে, সত্যিকার কাকতাড়ুয়াটাকে সরিয়ে দিয়ে। পুলিশ তন্নতন্ন করে খুঁজেও মার্কের হদিশ পায় না। বাড়ির থেকে বেরিয়ে ফ্রেঞ্চ যেন উবে গিয়েছে লোকটা। সিন্থিয়া আর জো গ্রামে ফিরে এসে রবার্টের সঙ্গে দেখা করলে রবার্ট এদের দু'জনকেই সমবেদনা জানায় এবং আশা প্রকাশ করে যে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া ওর মেয়ের শ্বশুর নিশ্চয়ই ফিরে আসবে একদিন। অ্যান্ডি একমাত্র আঁচ করতে পারে ব্যাপারটা কিন্তু ওর মুখ বন্ধ করানোর জন্য তো টাকাই যথেষ্ট।

রবার্ট একরকম বেঁচেই গিয়েছিল। কিন্তু হ্যালোইনের বিকেলে ভূত-পেত্নি-রাক্ষস-যোক্স সেজে বাচ্চাদের ঘুরতে বেরোনোর যে প্রথা, সেটাই কাল হল। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে ওর বাগানে ঢুকে পড়া বাচ্চাগুলো কাকতাড়ুয়াটাকে ছুঁয়েই চিৎকার করে উঠল। আর ঘুমন্ত রবার্ট সেই চিৎকারে জানলার সামনে এসে বুঝল যে ওর খেলা শেষ। মুহূর্তের মধ্যে বাচ্চাগুলোর সৌজন্যে সারা গ্রামের লোক জানবে যে মার্কের মৃতদেহ ওর বাগানে দাঁড়িয়ে আছে। আর গ্রামের লোক জানলে পুলিশ জানতে কতক্ষণ?

সেই পড়ন্ত বিকেলে নিজের রিভলভারটা নিজের মাথায় ঠেকিয়ে ট্রিগার টেনে দেয় রবার্ট। কয়েকদিন পর ওর মেয়ে-জামাই আবার গ্রামে এলে মার্ককে কবর দেওয়া হয় এবং গ্রামের বাইরে কবর দেওয়া হয় রবার্টকেও। যদিও ওর জন্য মন্ত্রোচ্চারণ হয়নি কোনও।

এটা আইওয়ারই ঘটনা। লোকমুখে অনেক কিছু জুড়েছে এবং বাদ পড়েছে। কিন্তু মূল গল্প এটাই। আর এটা থেকে সিনেমাও হয়েছে জানো তো। যদিও সেটা ভালো চলেনি। নাটকটা দেখে বেরিয়ে ওর গাইড হ্যারি টিফানখালার বললেন দীপ্রকে।

এই ক'দিনে মোটামুটি মানিয়ে নিয়েছে দীপ্র এখানে। আর নিজের কাজের প্রতি একনিষ্ঠ হলে, আমেরিকাতে মানিয়ে নেওয়া খুব কিছু কঠিনও নয়। কাজের বাইরে অন্য কিছু দেশটা বোঝে না তো। কাজ শুধু কাজ। তারপর পরিবার। ও কলকাতায় থাকতে ভাবত আমেরিকায় লোকজন বোধহয় হেবি ফুর্তি করে দিনরাত। কিন্তু এখানে এসে দেখল, ব্যাপার ঠিক উলটো। সকাল সাতটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত কাজে ব্যস্ত লোকজন। সন্ধে ছটার মধ্যে বাড়ি ফিরে গিয়ে বউয়ের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাচ্চার দুধ গরম করে। কৃষ্ণাঙ্গ, এশিয়ান, লাতিনরা সংখ্যায় অনেক বেড়ে যাচ্ছে সেই ভয়ে খাঁটি সাহেবরা এখন মত পারছে বাচ্চা নিচ্ছে। বিশেষ করে মিড ওয়েস্টে এই প্রবণতা খুবই বেশি। আর বাচ্চা বাড়লে স্বামী-স্ত্রী দু'জনের খাটনিই বাড়বে, এ আর বেশি কথা কি?

দেশের দখল মাথা নিয়ে নিতে হয়, বাচ্চার সংখ্যা দিয়ে নয়। কিন্তু এই সরল সত্য তুমি বোঝাবে কাকে? আমেরিকার লোকজন বেশিরভাগই গাম্বাট তো। টিফানখালার কফি খেতে খেতে বললেন দীপ্রকে একদিন।

দীপ্র চুপ করে রইল। কারণ, গাম্বাট হলেও লোকগুলোকে ভালোই লাগে ওর। অকারণে এরা কাঠি করে না কারও পিছনে, নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে। আরও যেটা ভালো সেটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটির ডিনকে ইউনিভার্সিটির টয়লেট পরিষ্কার করা লোকটা, বিকেল পাঁচটার পর 'হাই বব' বলে ডাকতে পারে। আর যাকে ডাকা হল সেও হাসিমুখেই, 'হাই চার্লস' বলে উত্তর দেবে। কেউ কারও চাকর বা মালিক নয়। একদিন টিভিতে একটা অনুষ্ঠানে দেখছিল, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কোনও এক ভদ্রমহিলার কাঁধে হাত রেখে কথা বলছিলেন বলে তার বর এসে বলছে, কাঁধটা ছেড়ে কথা বলতে। কারণ, বউটা প্রেসিডেন্টের নয়।

আচ্ছা, জি-ময়োন এয়ারপোর্টে যে ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপ হল, দীপ্র যদি তার সঙ্গে কথা বলে, তাহলে ভদ্রমহিলার হাজবান্ড কি রাগ করবেন? কিন্তু দীপ্র তো আর কাঁধে হাত রেখে কথা বলবে না।

নিজেই অবাক হল দীপ্র। ওর হঠাৎ করে কথা বলার ইচ্ছে জাগছে কেন ভিতরে? এমনটা তো ছিল না ও কখনও। তবে কি এই দশ দিন যে ও ফোন ছাড়া আর কোথাও বাংলা বলেনি এবং শুনতেও পায়নি, সেটা একটা চাপ ফেলছে ওর ওপরে? মানুষের স্বভাব কি এতটাই পরিস্থিতির উপরে নির্ভরশীল? নইলে দীপ্ররও কেন মনে হচ্ছে যে, ওই ভদ্রমহিলাকে একবার ফোন করে, দেখা করে কথা বলি একটু।

ঘুমিয়ে গিয়ে দেখে আবার নাটকটাই আবার স্বপ্নে দেখল দীপ্র। দেখল যে দীপ্রই মার্ক হয়ে গিয়েছে। মৃত মার্ক মানে সেই কাকতাড়ুয়া হয়ে গিয়েছে। আর বাইরের কেউ কিছু বুঝতেই পারছে না। এমন সময় ওই ভদ্রমহিলা এগিয়ে এসে ছুঁচ্ছেন দীপ্রকে। আর ছুঁয়েই চিৎকার করে উঠছেন, 'এ কী, আপনি মানুষ।'

দীপ্র অসহায়ের মতো বলছে, কিন্তু আমাকে মেরে দাঁড় করিয়ে রেখেছে জানেন তো। আপনি কি এমন কিছু করতে পারেন, যাতে আমি আবার বেঁচে উঠি, হেঁটে চলে ঘুরে বেড়াই।

ভদ্রমহিলা খিলখিল করে হেসে উঠছেন। যে হাসির সামনে মানুষ তো ছাড়, ভগবানেরও মাথা ঘুরতে বাধ্য।

ঘুমটা ভেঙে যেতে দীপ্র দেখল ঘামে ভিজে গিয়েছে ওর গা। ওর মনে হল, ওর যে একটা মোবাইল হয়েছে সেই খবরটা ভদ্রমহিলাকে একটা ফোন করে জানানো দরকার। পার্সের ভিতর থেকে কাগজের টুকরোটা বের করে ভদ্রমহিলার নিজের হাতে লিখে দেওয়া নামটা আবার পড়ল দীপ্র।

আচ্ছা কী বলে কথা শুরু করবে ও ওঁর সঙ্গে? হ্যালো, বিশাখা বলছ? নাকি বিশাখা ম্যাডাম বলছেন?

(চলবে)

boierpathshala.blogspot.com

পর্ব ৬

থাকে শুধু অন্ধকার

■ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

১১

কলকাতার রাস্তায় দশটা লোককে দাঁড় করিয়ে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, দেশ কোথায় ছিল, তাহলে ছয় থেকে সাতজন বলবে, চট্টগ্রাম, ঢাকা, ফরিদপুর কিংবা বরিশাল। আমেরিকাতে যদি দশ জনকে দাঁড় করিয়ে এই একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয়, তাহলে বেশিরভাগ সময় দশ জনের ভিতর দশ জনই বলবে, ফ্রান্স, স্পেন, ইংল্যান্ড, জার্মানি কিংবা ভারত, চিন অথবা আফ্রিকা মহাদেশ। আমেরিকার আদি বাসিন্দা মানে আমেরিকান ইন্ডিয়ানরা একরকম মুছেই গিয়েছে দেশটা থেকে, ইতিউতি অল্পস্বল্প টিকে আছে কোনওরকমে। ওকলাহোমা, কলোরাডো, নেব্রাস্কা, ডাকোটা, এইসব রাজ্যগুলোতেই ওই পুরোনো ইন্ডিয়ান ওরিজিন-এর লোকজনের খোঁজ মেলে বেশি। ওদের ভিতরে একটা কথা খুব প্রচলিত— 'তুমি পৃথিবীর যত্ন নাও, পৃথিবীও তোমার যত্ন নেবে'।

শান্তনু দত্ত সেই কথাটাকেই একটু বদলে নিয়ে করেছে, 'তুমি তোমার বউয়ের যত্ন নাও, তোমার বউও তাহলে তোমার যত্ন নেবে'। কিন্তু মজাটা হল, বিশাখা এতটাই আত্মনির্ভর যে ওর যত্ন নেওয়ার জন্য তেমন কাউকে দরকার হয় না। ও নিজেই যথেষ্ট নিজের জন্য। আর পৃথিবীতে যে লোকগুলো নিজের সমস্যা নিজে সামলে নিতে পারে, তাদের কাছেই অন্য অনেকে ধমড়ি খেয়ে পড়ে। নিজের-নিজের সমস্যা মেটানোর জন্য।

শান্তনুর সমস্যাই কি মিটত বিশাখা ছাড়া? আর কীভাবে, কতটা রিস্ক নিয়ে বিশাখা ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, সেটা জীবন থাকতে ভুলতে পারবে না শান্তনু।

—তুমি তো তার প্রতিদানও দিয়েছ। একটা গ্যাঁচে পড়ে থাকা মেয়েকে বিয়ে করে ইউএসএ নিয়ে এসেছ। নাও আনতে পারতে। সাত দিন আমার সঙ্গে মজি করে যদি কেটে পড়তে, আমি কি আটকাতে পারতাম বলো? বিশাখা বলত।

—যে সাতদিনের জন্য তোমায় পেয়েছে, তার পক্ষে কি আর সাত মিনিটও তোমায় ছেড়ে থাকা সম্ভব? উত্তর দিত শান্তনু।

—কেন সম্ভব নয়?

—কারণ, ছেড়ে দিলেই অন্য পাঁচজন ঝাঁপিয়ে পড়বে। তোমার যা রূপ তাতে...

—ধ্যাত, রূপ আর ক'দিনের। আর আমি এমন কিছু রূপসীও নই। বিশাখা খিলখিল করে হেসে উঠত।

সেই হাসির সামনে হাঁটু কাঁপত শান্তনুর। প্রথমদিন যখন দেখেছিল তখন যেমন, আজও তেমন। একটা পাহাড়ি নদী যেমন নিজের চলার পথের সমস্ত পাথরকে ডিঙিয়ে দেয় স্রোতের শক্তিতে, বিশাখাও তেমন। পৃথিবীর সব পুরুষকে দিয়ে নিজের জুতো খোলাতে, আবার পরাতে পারে, শান্তনুর মনে হত।

—তোমায় দিয়ে কবে জুতো খুলিয়েছি? বলতে বলতে শান্তনুর শার্টের বোতাম একটা একটা করে খুলত বিশাখা।

শান্তনু উত্তেজনা আর আবেগে ফুটতে ফুটতে দেখত ওর সামনে একটা ম্যাল বিরাট হাঁ করছে। জন্তু-জানোয়ার কোন ছার, গোটা ব্রহ্মাণ্ডই গিলে নেবে বলে।

কিন্তু, প্যাট্রিককে গিলতে পারল না বিশাখা। ট্রেনার কোনও ত্রুটি বিশাখা করেনি আর যথাযোগ্য সঙ্গত করে গিয়েছে শান্তনু। কিন্তু, মঞ্চ তৈরি থাকলেও যেমন অনেক সময় গায়ক গান করে না, প্যাট্রিক সেভাবেই সাড়া দেয়নি ইশারায়। সাহেবগুলো এমনই রসকসহীন যে যৌনতার সাংঘাতিক আবেদনের কাছেও মেশিনের মতো বসে থাকে। কিংবা যে কাজের জন্য প্রোগ্রামড সেটাই করে। একটু গণ্ডের বাইরে গিয়ে ভাবতে পারে না। কিংবা এমনও হতে পারে যে, এই হাজারও উদ্ভাবন স্বর্গরাজ্য আমেরিকা ভগবান নিজেও সেটলার যেখানে আইনের সুতোয় এমন শক্ত করে বাঁধা যে প্যাট্রিকের মতো লোকদের মেশিন হয়েই থাকতে হয়। পান থেকে চুন খসলেই এখানে আইন এসে গলা টিপে ধরে। রাস্তায় স্পিড-লিমিট ভাঙলে আইন, বারে মদ খেতে খেতে চিৎকার করে উঠলেও আইন। শান্তনুর পরিচিত একটি ছেলের বাবা দেশ থেকে আসার পরপরই গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন এই আইনের ঠেলায়। সুগারের-রোগী সেই বয়স্ক ভদ্রলোক বেগ সামলাতে না-পেরে ছেলেকে হাইওয়ের ধারে গাড়িটা একটু রাখতে বলেছিলেন। কিন্তু জঙ্গল সমান ঘন গাছের সারির মধ্যে দাঁড়িয়ে বিয়োগ করছেন যখন, তখনই পুলিশের গাড়ি চলে আসে স্পটে এবং সত্তর পেরনো ভদ্রলোককে নিজেদের জিম্মায় নিয়ে নেয়।

—আচ্ছা ওরা কি ওই জঙ্গলে সেনসর বসিয়ে রেখেছিল নাকি? নইলে টের পেল কী করে? ছেলেটি পরে জিজ্ঞেস করেছিল শান্তনুকে।

শান্তনু কোনও উত্তর দিতে না পারলেও অনুভব করেছিল যে, এই দেশটার সর্বত্র সেনসর। আইনের বাইরে এক পা গেলেই ধরবে।

—সেক্ষেত্রে আইনটাকে ব্যবহার করেই এগোতে হবে। বে-আইনি কাজগুলো করার জন্য সেই সিঁড়ি দিয়েই উঠতে বা নামতে হবে। আইনি কাজগুলো করে যেগুলো দিয়ে ওঠা বা নামা যায়। বিশাখা ওর দুর্ভাবনার কথা জেনে বলেছিল।

—আইনমাফিক আইনের ফাঁক গেলে বেরোব? কীভাবে সম্ভব সেটা? শান্তনু অবাক হয়েছিল।

—ভাবতে দাও। এত ইনস্ট্যান্টলি এসব কাজ করা যায় না। কথাটা বলে সামনে থেকে সরে গিয়েছিল বিশাখা।

শান্তনু একটা নিশ্বাস ফেলেছিল। ভাবুক, বিশাখাই ভাবুক। ওর মাথা অনেক বেশি শার্প। ও যে রাস্তা ঠিক করবে সেটা ধরে এগোলে নিশ্চয়ই এই বিপদ থেকে পরিত্রাণের একটা রাস্তা পাওয়া যাবে।

নিউ ইয়র্কে যে আশা নিয়ে গিয়েছিল সেই আশা একটুও না মেটায় ধসে গিয়েছিল শান্তনু। জিমঘোনে ফিরেই বোতল নিয়ে বসেছিল।

বিশাখা ওর দিকে কর্ডলেসটা এগিয়ে দিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, চমকাবে কিন্তু ধমকাবে না।

শান্তনু চুপচাপ ফোনটা ওর হাত থেকে নিয়ে নিল। বিশাখা যখন কাজটা করতে বলছে তখন নিশ্চয়ই কোনও কারণ আছে।

—হ্যালো, ছজ স্পিকিং? গলাটা ভারী করে জিজ্ঞেস করল শান্তনু।

১২

বিজ্ঞাপনের কপিটা একরকম তৈরিই করে ফেলে সুচন্দ্রা। 'পড়বে মনে আজ/সাবেক কালের বাঁধা' এই শব্দবন্ধটা লিখে ও যখন ওর বসকে গিয়ে দেখায়, উনি বেশ খুশি হন। তারপর এটা-ওটা বলতে বলতে বলেন, আরও কিছু অ্যাড করা যায় কি না, সেটা দেখতে। ওঁর চেম্বার থেকে বেরিয়ে এসে সুচন্দ্রা ভাবছিল যদি সত্যিই কিছু অ্যাড করতে পারত

পান থেকে চুন খসলেই এখানে আইন এসে গলা টিপে ধরে। রাস্তায় স্পিড-লিমিট ভাঙলে আইন, বারে মদ খেতে খেতে চিৎকার করে উঠলেও আইন। শান্তনুর পরিচিত একটি ছেলের বাবা দেশ থেকে আসার পরপরই গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন এই আইনের ঠেলায়। সুগারের রোগী সেই বয়স্ক ভদ্রলোক বেগ সামলাতে না-পেরে ছেলেকে হাইওয়ের ধারে গাড়িটা একটু রাখতে বলেছিলেন। কিন্তু জঙ্গল সমান ঘন গাছের সারির মধ্যে দাঁড়িয়ে বিয়োগ করছেন যখন, তখনই পুলিশের গাড়ি চলে আসে স্পটে এবং সত্তর পেরনো ভদ্রলোককে নিজেদের জিম্মায় নিয়ে নেয়।

boierpathshala.blogspot.com

তাহলে লিখত যে, ভীষণ বিখ্যাত একটা সাপ নিজের নাম বদলে ফিরে আসছে। চেহারাও কিছুটা অন্যরকম হবে হয়তো, কিন্তু মূল ব্যাপারটা পালটাবে না তাতে। অতএব চারপাশের সবাই খুব সাবধান। সত্যি করে এই কথাগুলো লিখতে না বলতে পারলেই শান্তি পেত সুচন্দ্রা। খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠত যদি চাকরিটায় লাথি মেরে বেরিয়ে আসতে পারত। কিন্তু, জীবনে মানুষ যা চায়, তার কতটুকু করে উঠতে পারে? হাসপাতালে ওর আত্মীয়রা যখন ওকে খোঁচাচ্ছিল, বাবার শরীর আগে থেকে কোনও অসুবিধার কথা জানান দিয়েছিল কি না জানতে চেয়ে, ওর মনে হচ্ছেছিল ওদের মুখের ওপর বলে দেয়, এত-এত বছর যে মানুষটার শরীর কিংবা মন কিছুরই খোঁজ নেননি, আজ হঠাৎ করে তার বাঁচা-মরা নিয়ে এত চিন্তা না-করলেও চলবে।

কিন্তু বলেনি। কারণ, হাসপাতালে ওর বাবাকে যারা দেখতে এসেছে, সমাজের নিয়ম অনুসারে তারা সবাই ওর এবং মায়ের কৃতজ্ঞতার পাত্র। তারা নিজেদের ব্যস্ত শিডিউল থেকে সময় বের করে বাবাকে যে দেখতে এসেছে অন্তত তাতেই কৃতার্থ হয়ে যাওয়া উচিত ওদের। এসব ভেবেই চুপ করেছিল সুচন্দ্রা, নকল একটা হাসি মুখে ফুটিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল আর ভাবছিল, অফিস থেকে যতটা টাকা পাওয়ার প্রতিশ্রুতি পেয়েছে, তার বাইরে আরও কতটা টাকা লাগবে, বাবার বুকে স্টেন্ট বসানোর জন্য।

বসেই ছিল বাবা। বসে বসে ওর সঙ্গে গল্প করছিল রাতের খাওয়া-দাওয়ার পর। মা রান্নাঘরে বাসনপত্র গুছিয়ে রাখছিল সিঙ্কে। হঠাৎ সুচন্দ্রা খেয়াল করে বাবা খুব ঘামছে। বৃষ্টি হয়েছে। তাপমাত্রা বেশ খানিকটা কম কিন্তু তাও বাবার কপাল-জোড়া ঘাম দেখে অবাক লাগে সুচন্দ্রার। প্রথমে কিছু না বললেও, একটু পরেই ও জিজ্ঞেস করে, শরীর ঠিক আছে তো বাবা?

—ঠিকই তো ছিল। কিন্তু এখন কেমন যেন একটা অস্বস্তি হচ্ছে। কীরকম একটা জড়ানো গলায় উত্তর দেয় বাবা।

—বাবাকে সন্ধেবেলা প্রেশারের ওষুধটা দিয়েছিলে মা? সুচন্দ্রা হাঁক পাড়ে।

—হ্যাঁ, দেব না কেন? বলতে বলতে ঘরে ঢোকে মা।

ওইটুকু সময়ের মধ্যে বাবা বুকে একটা হাত দিয়ে শুয়ে পড়েছে বিছানায় আর কীরকম যেন ছটফট করছে।

সুচন্দ্রা হকচকিয়ে যায় প্রথমটা। তারপর নাইটি পরেই নীচে নেমে গিয়ে রাস্তাটা ক্রস করলেই যে ওষুধের দোকান সেখানে গিয়েছিল ডাক্তারের খোঁজে। কিন্তু না, ডাক্তার অতক্ষণ বসে থাকেন না দোকানে। আর এখন ফোনেও তাকে পাওয়া সম্ভব নয় বলে জানিয়ে দেয় দোকানি। তারপর লোকটা স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই সুচন্দ্রাকে বলে যে এখন কলকাতা শহরে রাত-বিরেতে ডাক্তার পাওয়া যায় না। সেরকম অসুবিধে বুঝলে সুচন্দ্রা যেন কোনও প্রাইভেট হাসপাতালে ফোন করে। তারাই অ্যাম্বুলেন্স পাঠিয়ে পেশেন্টকে নিয়ে যাবে।

—প্রাইভেট হাসপাতাল মানে তো অনেক টাকার ব্যাপার! পারবি? ভয় আর কান্নার ভিতর থেকে জিজ্ঞেস করেছিল মা।

—এখন ওসব ভাবার সময় নেই মা। সরকারি হাসপাতালে গিয়ে যদি বেড না পাই, কী হবে তখন? সুচন্দ্রা জবাব দিয়েছিল।

তারপর যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে মানুষ যেভাবে কাজ করে, ঠিক সেভাবেই বাবাকে নিয়ে এসে ভর্তি করিয়েছিল এখানে। ফ্ল্যাটের কেয়ারটেকার, এক-দু'জন প্রতিবেশী সাহায্য করেছিলেন অনেকটা। বাবা ততক্ষণে কাটা পাঁঠার মতো দাপাতে শুরু করেছে। অ্যাম্বুল্যান্সের ভিতর বাবার হাতটা ধরে বসেছিল সুচন্দ্রা। আর সারাক্ষণ চেষ্টা করছিল অনভ্যস্ত আঙুলগুলো দিয়ে বাবার পালস মাপার। ক্ষণে পাচ্ছিল, ক্ষণে হারাচ্ছিল। আর চোরাস্রোতের মতো একটা ভয় এসে শুকিয়ে দিচ্ছিল গলার ভিতরটা। মনে হচ্ছিল, শক্তপোক্ত কেউ যদি পাশে থাকত এই সময়টা।

বাবার হার্ট অ্যাটাকই হয়েছিল। আর যাই হোক না কেন একটা মানুষের হার্ট অ্যাটাক মানেই লাইফ রিস্ক। তবু আয়ু থাকলে তো মানুষ মরে না, আর যে ডাক্তার বাবার চিকিৎসা করছিলেন, তিনিও অসম্ভব দক্ষ। সুচন্দ্রা আর ওর মায়ের সব আশঙ্কার নিরসন করে বললেন যে আপাতত দুটো স্টেন্ট বসালেই চলবে। বাইপাস ইত্যাদির কোনও দরকার নেই। কৃতজ্ঞতায় চোখে জল এসেছিল সুচন্দ্রার। সেই কৃতজ্ঞতা ওর অফিসের প্রতিও জন্মাল যখন খুব দ্রুততার সঙ্গে ওর অ্যাপ্লিকেশনের উত্তরে ষাট হাজার টাকা মঞ্জুর করে দেওয়া হল। বিপদে পড়লে কৃতজ্ঞতার বোধটাই হয়তো বেশি আঘাত হয়ে ওঠে। যে আত্মীয়দের প্রথমদিন দেখে গা-পিত্তি জ্বলে যাচ্ছিল তারা আবার পরদিন ভিজিটিং আওয়ারে এলে, কেন মনে হল, কোথাও না কোথাও ওরাও নিশ্চয়ই কিছু ফিল করে।

যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে মানুষ যেভাবে কাজ করে, ঠিক সেভাবেই বাবাকে নিয়ে এসে ভর্তি করিয়েছিল এখানে। ফ্ল্যাটের কেয়ারটেকার, এক-দু'জন প্রতিবেশী সাহায্য করেছিলেন অনেকটা। বাবা ততক্ষণে কাটা পাঁঠার মতো ছটফট শুরু করেছে। অ্যাম্বুল্যান্সের ভিতর বাবার হাতটা ধরে বসেছিল সুচন্দ্রা। আর সারাক্ষণ চেষ্টা করছিল অনভ্যস্ত আঙুলগুলো দিয়ে বাবার পালস মাপার। ক্ষণে পাচ্ছিল, ক্ষণে হারাচ্ছিল। আর চোরাস্রোতের মতো একটা ভয় এসে শুকিয়ে দিচ্ছিল গলার ভিতরটা। মনে হচ্ছিল, শক্তপোক্ত কেউ যদি পাশে থাকত এই সময়টা।

দীপ্রর মা খবরটা পেয়ে দেখতে এসেছিলেন হাসপাতালে। বাবার সামনে একটাই টুল, সেটায় বসে বলছিলেন, কোনও চিন্তা করবেন না। আমরা তো আছি।

বাবার গলা কেঁপে গিয়েছিল, মেয়েটার দায়িত্ব...

—আপনার মেয়ে যেরকম স্ট্রং তাতে ওর দায়িত্ব কারও নেওয়ার দরকার নেই। আমার তো মনে হয় ওই একটা সংসারের দায়িত্ব নিতে পারবে হেসে খেলে।

—সে তো আপনাদের উপর নির্ভর করছে। মা বলে উঠেছিল।

সুচন্দ্রার অস্বস্তি লাগছিল। হাসপাতালের ওই একটা ঘরে, আরও চারজন রোগীর সঙ্গে শুয়ে থাকা ওর বাবার সামনে দীপ্র আর ওর মা ছাড়াও, তখন সুচন্দ্রা নিজে এবং ওর এক মাসি। সুচন্দ্রা চাইছিল না মাসির সামনেই এইসব কথাবার্তা হোক এবং ছড়াক। কারণ, মার সঙ্গে ওর বিয়ে হওয়ার কথা সে তো নিজে থেকে একটা ফোনও করেনি সুচন্দ্রাকে। লজ্জার মাথা খেয়ে সুচন্দ্রা ফেসবুকে ঘটনাটার কথা মেসেজ করেছে দীপ্রকে। সেই মেসেজ দীপ্র যে দেখেছে, ফেসবুক তাও দেখাচ্ছে। কিন্তু, তারপরও কোনও ফোন আসেনি তো সুচন্দ্রার কাছে।

—আপনার ছেলে জানে?

—জানাব আমি। আজ বা কাল ও ফোন করলেই। সুচন্দ্রার মায়ের কথার উত্তরে জবাব দিয়েছিলেন দীপ্রর মা।

সুচন্দ্রা তখন স্বাভাবিক সঙ্কোচেই বলতে পারেনি যে দীপ্রকে ও ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ভিজিটিং আওয়ার শেষ হওয়ার পর ওর সঙ্গে লিফটে নামতে নামতে দীপ্রর মা যখন ওকে বললেন যে, কোনও সমস্যায় ওঁকে জানাতে দ্বিধা না করতে, সুচন্দ্রা চুপ করে থাকতে পারল না আর।

—ঠিক কোন অধিকারে জানাব বলুন তো? ভদ্রমহিলার মুখের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল সুচন্দ্রা।

১৩

আইওয়া তো আমেরিকার শস্যভাণ্ডার বলে পরিচিত। কিন্তু এখানে উৎপাদিত অধিকাংশ গম আর ভুট্টাই আমেরিকার গরু আর শুয়োরদের খাওয়াতে চলে যায়।

—তাহলে আমেরিকানরা কোথাকার গম খায়? দীপ্র জিজ্ঞেস করেছিল টিফানথালারকে।

—মেক্সিকো থেকে আসে, আরও অন্যান্য জায়গা থেকেও। একটু অন্যমনস্ক হয়ে জবাব দিল, টিফানথালার। তারপর বেশ উত্তেজিত হয়ে যোগ করল, মাংসে প্রোডিউস করার খরচ শুনলে তোমার মাথা খারাপ হয়ে যাবে। কৃত্রিমভাবে গরু আর শুয়োরদের মোটা করতে গিয়ে কত শস্য যে খাওয়াতে হচ্ছে ওদের তার ইয়ত্তা নেই। এই করতে গিয়ে প্রকৃতির ওপর সাঙ্ঘাতিক চাপ সৃষ্টি করছি আমরা। কিন্তু, মাংস চাই, আরও মাংস চাই, এই হয়ে দাঁড়িয়েছে লক্ষ্য। এর ফল খুব খারাপ হবে, আমি বলে দিচ্ছি তোমায়।

দীপ্রর বিরক্ত লাগছিল ওইসব কথা শুনতে। আমেরিকাতে এসেছে চুটিয়ে বিফস্টেক আর পর্ক রিবস খাবে বলে। কিন্তু এখানেও এখন এইসব 'ভেগান'-দের বাড়বাড়ন্ত শুরু হয়েছে। যেন সারাজীবন নিরামিষ খেয়ে শুকিয়ে থাকবে বলে মানুষ দুনিয়ায় এসেছে! সেদিন রাতে জমিয়ে হ্যামবারগার খেল দীপ্র। কিন্তু তারপরই ফোন করে যা ঝাড় খেল তেমনটা ও জীবনে কমই খেয়েছে। আশ্চর্য, ভদ্রমহিলা নিজেই তো ফোন করতে বলেছিলেন। এবং সেটাও একটা উইকএন্ডে। তাহলে শনিবার রাতে ফোন করে অন্যায়টা কী করল দীপ্র?

—কী ব্যাপার, কেন ফোন করেছেন?

—আমি মানে, বিশাখাকে...দীপ্র তুতলে গেল।

—বিশাখা কি আপনার ক্লাসমেট? এমনভাবে কথা বলেছেন মনে হচ্ছে বহু বছরের চেনা। কোথায় পরিচয় হয়েছিল, বলুন।

—অ্যাকচুয়ালি এয়ারপোর্টে উনিই নাম্বারটা দিয়েছিলেন।

—আপনি চেয়েছিলেন বলেই দিয়েছিলেন নিশ্চয়ই। যেচে তো আর দিতে যায়নি।

—আমি বোঝাতে পারছি না ঠিক...

—কিছু বোঝানোর দরকার নেই। টেল মি ইয়োর নেম অ্যান্ড অ্যাড্রেস। বিশাখা আপনার নাম শুনে যদি জরুরি মনে করে, তাহলে রিং ব্যাক করবে আপনাকে। আর ওর কথা শুনে যদি বুঝতে পারি যে আপনি ফালতু কলার, বিরক্ত করার জন্য ফোন করেছেন, তাহলে ফোনটা আমি করব। অ্যান্ড বি প্রিপেয়ার্ড ফর দ্যট অলসো।

দীপ্র ফোনটা ছেড়ে গুম হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। আর নিজের উপর বিস্তারের সঙ্গেই গোটা পৃথিবীর যেখানে যত মেয়ে আছে, সবার প্রতি প্রচণ্ড রাগ জন্মাল ওর। ইচ্ছে করল রাস্তায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে, মেয়েদের নামে যা নয় তাই বলে। কেন তারা গাছে তুলে মই কেড়ে নেয়? কেন আশা দিয়ে আশা ভাঙে? কেন পশ্চিমে যাবে বলে উত্তরে গিয়ে দাঁড়ায়? কেন তারা এমনভাবে হাসে যে হাসির ইশারায় নিশি-পাওয়া মানুষের মতো রাস্তায় বেরিয়ে আসে পুরুষেরা আর তারপর টের পায়, রাস্তা নয় এ আসলে এক বিরাট সুড়ঙ্গ যার শেষে কোনও আলো চোখে পড়ছে না।

মায়ের ফোনটা তখনই আসে। দীপ্র প্রথমবার না ধরলেও আবার আসে। আর দীপ্রর মনে পড়ে যায় যে ওর মা, ওর বোনও মেয়ে। তবু রাগ কমে না ওর। গায়ে জলবিছুটি ঘসে দিলে যেমন জ্বলে তেমনই জ্বলে যেতে থাকে ওর অন্তরাত্মা। ইচ্ছে করে ওই বিশাখার সামনে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, কেন এতটা অপমান করলেন আমাকে? আমি কী ক্ষতি করেছি আপনার?

মা দু'-একটা অন্য কথার পর বলে, জানিস তো সুচন্দ্রার বাবার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। এখন ভালোই আছেন কিন্তু বেশ বাড়াবাড়িই হয়েছিল। মেয়েটা একা হাতে যেভাবে সব সামলেছে শুনলাম তাতে কিন্তু আমার ওকে খুব ভরসাযোগ্য মনে হয়েছে।

—আমার এখন এসব শোনার মুড নেই মা। ভীষণ ক্লান্ত আমি আজ।

—মুড নেই বললে তো হবে না, কথা শুনতে হবে। এখানে কোথায় কী হচ্ছে সব জানতে হবে। আজ ওই মেয়েটার বাবার কী হয়েছে তা শুনতে চাইছ না, এরপর নিজের বাবা-মার কিছু হয়েছে শুনলে কী করবে? ফোন কেটে দেবে?

—বাজে বোকো না তো। আমি জানি ওর বাবার কী হয়েছে।

—কী জানিস? কীভাবে জানিস?

—ওই মেয়েটাই ফেসবুকে জানিয়েছে আমায়।

—বাহ। খুব ভালো। তা জানিয়েছে মানে তোর একটা ফোন এক্সপেক্ট করছে মেয়েটা। করেছিলি সেই ফোন?

—না করিনি।

—তাহলে একটা ফোন কর বাবা। মা অনুরোধের গলায় বলল।

—না ফোন করব না, আমি আর কোনও মেয়েকে কোনওদিন ফোন করব না। কেন ফোন করব? অপমানিত হতে? দীপ্র চেঁচিয়ে উঠল। *(চলবে)*

boierpathshala.blogspot.com

পর্ব ৭

থাকে শুধু অন্ধকার

■ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

আমেরিকায় আসার আগেই একটা সিনেমা দেখেছিল দীপ্র। সেখানে বেশ বড়সড় একটা মোরগ লালমাটির পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে। সদ্য ভোর হয়েছে, ঘাসের শিশির ঝলমল করছে রোদে। হঠাৎ মোরগটা শুনতে পায় একটা মুরগি ডাকছে। মুরগির প্রেমের ডাক ওটা, মোরগ বুঝতে পারে। সে এদিক তাকায়, ওদিক তাকায়। তারপর ডাকটা কানে নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে। এক পা যায়, দু' পায় যায়, দশ পা যায়। আবার ডেকে ওঠে মুরগি। সেই ডাক শুনে মোরগটা যেন পাগল হয়ে ওঠে। দ্রুতপদে এগিয়ে যেতে থাকে। যেতে যেতে তিন-চারটে গাছের ফাঁক গলে একটা খোলা জায়গায় এসে দাঁড়ায়। আর দাঁড়াতেই দুম করে এরোপ্লেন থেকে গুলি ছুটে এসে লাগে ওর বুকে। ছিটকে পড়ে মোরগটা। সামনে দাঁড়িয়ে হো হো করে হাসতে থাকে শিকারি। তার হাতে একটা ছোট্ট টেপ রেকর্ডার যাতে মুরগির ডাকটা রেকর্ড করা।

পৃথিবীতে অনেক রকম শব্দ শুনেও মানুষকে সতর্ক থাকতে হয়। কেউ পারে, কেউ পারে না। বিশাখা বৌদির, নাকি বিশাখারই হাসির শব্দটা শুনে যদি প্রথম দিনই মনে হত ওই মুরগিটার কথা তাহলে এত কথা থোড়াই শুনতে হত? মায়ের ফোনটা রেখে দিয়ে ভাবছিল দীপ্র।

কিন্তু যা মনে হয়নি, তা কেন মনে হয়নি ভেবে লাভ নেই। তার চেয়ে যা হয়ে গিয়েছে তাকে ভুলে সামনের দিকে তাকানোই কি শ্রেয় নয়? ভাবতে ভাবতে দীপ্র ফেসবুক খুলে ইনবক্সে গেল। 'বাবা খুব দ্রুত সুস্থ হয়ে যাবেন আশা রাখছি', লিখে মেসেজটা পাঠিয়ে দিল সুচন্দ্রাকে। তারপর ওর প্রোফাইলে গিয়ে ছবিগুলো দেখতে লাগল। বেশ একটা 'শ্রী' আছে মেয়েটার মুখে। বউ হলে খারাপ লাগবে না। আর তাছাড়া মায়ের যখন এত পছন্দ তখন দীপ্রই বা জেদ ধরে থেকে করবে কি? নিজে কাউকে জোটাতে না-পারলে, অন্যের পছন্দেই আস্থা রাখতে হবে। আর সেই অন্য যদি নিজের মা হয় তাহলে ভরসাটা সহজেই রাখা যায়। রাখা উচিতও। ভাবতে ভাবতে চোখ বন্ধ করল দীপ্র। আর বন্ধ চোখের ওপাশে সেই

যা মনে হয়নি, তা কেন মনে হয়নি ভেবে লাভ নেই। তার চেয়ে যা হয়ে গিয়েছে তাকে ভুলে সামনের দিকে তাকানোই কি শ্রেয় নয়? ভাবতে ভাবতে দীপ্র ফেসবুক খুলে ইনবক্সে গেল। 'বাবা খুব দ্রুত সুস্থ হয়ে যাবেন আশা রাখছি' লিখে মেসেজটা পাঠিয়ে দিল সুচন্দ্রাকে। তারপর ওর প্রোফাইলে গিয়ে ছবিগুলো দেখতে লাগল। বেশ একটা 'শ্রী' আছে মেয়েটার মুখে। বউ হলে খারাপ লাগবে না। আর তাছাড়া মায়ের যখন এত পছন্দ তখন দীপ্রই বা জেদ ধরে থেকে করবে কি? নিজে কাউকে জোটাতে না পারলে, অন্যের পছন্দেই আস্থা রাখতে হবে।

হাসিটা বেজে উঠল আবার। সেই ঝরনা আবার একটা নদীর মতো বইতে শুরু করল যেন। বালিকের গজলাত থেকে কলসে ওঠা আলো পৃথিবীর সব বন্ধ চোখ ভেদ করে হৃৎপিণ্ড অবধি পৌঁছে যেতে পারে দীপ্রর মনে হল। ওই এয়ারপোর্টের দেখাই কি প্রথম আর শেষ দেখা? আর একবারও দেখা হবে না, বিশাখার সঙ্গে?

১৪

মিড ওয়েস্টের ছোট্ট শহর অ্যামেস। এখানে চোখ-ধাঁধানো কোনও স্থাপত্য নেই, নেই চমকে দেওয়া ডাউনটাউন। আধা-ঘুমন্ত এই শহরটা পড়াশোনার কারণেই বিখ্যাত আর সেই সূত্রে আমেরিকার ভিতরকার এবং বাইরের থেকে অনেক ছেলেমেয়ে আসে এখানে। আর যেহেতু আইয়ার মাটি একদম সোনা সোনা, তাই কেবল ভুট্টা বা গম নয়, হরেকরকম সবজি বেশ কম দামেই পাওয়া যায় এখানে।

মোবাথা বলে দক্ষিণ আফ্রিকার একটি ছেলেও টিফানথালারের কাছেই রিসার্চ করছে। কয়েকদিনেই দীপ্রকে বেশ আপন করে নিয়েছে ছেলেটা। যদিও কথা একটু বেশি বলে, তবু দীপ্রর বেশ ভালোলাগে যখন মোবাথা ওকে অ্যামেসের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে নিয়ে যায়। মোবাথার হাত ধরেই ফার্মারস মার্কেট চিনেছিল দীপ্র। কত কত চাষি সেখানে নিজের ক্ষেতের সদ্য উৎপাদিত ফসল নিয়ে আসেন এবং সরাসরি বিক্রি করেন খরিদ্দারকে। বিরাট বিরাট সব কুমড়ো, বড় বড় বেগুন, ঢেঁড়স সব ঢাঁড়শ। ঢাঁড়শকে এরা 'ওকরা' বলে, বেগুনকে, 'এগপ্ল্যান্ট'। কোথাও কোনও দালাল নেই, ফড়ে নেই, দরদামও তেমন একটা নেই, শুধু উৎপাদক আর ক্রেতা মুখোমুখি। ওই চাষি-বাজারেই আবার আইওয়ার বিখ্যাত আপেল এবং এবং তার থেকে তৈরি অ্যাপেল টার্ট, অ্যাপেল পাই নিয়ে বসে থাকে অনেকে। কী অপূর্ব সেসবের স্বাদ।

আপেল ভালোবাসো তুমি? তাহলে তোমায় একটা জায়গায় নিয়ে যাব। মোবাথা দীপ্রকে বলল একদিন। আর তারপর একটা শনিবার সকালে সাইকেলে চেপে ওরা দু'জন রওনা দিল শহর থেকে দূরে একটা আপেল বাগানের দিকে। কলকাতা হলে অতক্ষণ সাইকেল চালাতে পারত না দীপ্র কিন্তু এমনই আবহাওয়ার গুণ এই মিড-ওয়েস্টের যে সহজে ক্লান্ত হয় না কেউ। সাইকেলকে এরা 'বাইক' বলে আর রাস্তাঘাটে গাড়ি নয় এই বাইকেরাই ভিড়। দু'বার থেমে শেষমেষ যেখানে গিয়ে পৌঁছল সেই জায়গাটা বাইরে থেকে আলাদা কিছুই নয়, গেট পেরিয়ে ঢোকার পরও তেমন কিছু না। কিন্তু, টিকিট কাটার পর আরও অনেক টুরিস্টের সঙ্গে একটা ট্রাক্টরের মতো গাড়িতে চেপে যেখানে গিয়ে পৌঁছল, তেমন কিছু আগে সত্যিই দেখেনি দীপ্র। চারপাশের গাছে থোকা থোকা আপেল। কোনওটা লাল, কোনওটা খয়েরি, কোনওটা একটু মেরুন, কোনওটার বা সবজেটে আভা।

—খাও না, যত ইচ্ছা খাও। ফ্রি তো। বোমাথা বলল।

—ফ্রি মানে? দাম নেই এই আপেলগুলোর? দীপ্র অবাকই হল।

—হে হে। তুমি আইওয়ার আপেল বাগানে নিয়ম জানো না? বাগানে ঘুরতে ঘুরতে তুমি যত আপেল খাবে, তার একটার জন্যেও দাম দিতে হবে না তোমায়। কিন্তু ঝুড়িতে করে যে-কটা বাইরে নিয়ে যাবে, তার জন্য চার্জ করা হবে তোমায়।

—ভালো নিয়ম তো।

—ইয়েস স্যার। প্রথম যখন ইউএসএ-তে এসেছি, ডলারশিপের টাকা পাচ্ছি না, তখন এই আপেল খেয়েই তো দিন কাটত। এক-একদিন পনেরো কুড়িটা করেও আপেল খেয়েছি বাগান ঘুরে ঘুরে।

মোবাথার কথায় হেসে ফেলল দীপ্র। কুড়ি মাইলের উপর সাইকেল চালিয়ে দিনের পরদিন একটা লোক আপেল খেতে যাচ্ছে, শুনলে মজাই লাগে।

আচ্ছা আপেলের বদলে যদি ভাত হত, তাহলে কি মজা লাগত? মোটেই না। কারণ, অ্যামেসে আসা ইস্তক ভাত না-খেয়ে দীপ্রর পাগল পাগল লাগছিল। এখানে ভারতীয় তেমন নেই বলে ইন্ডিয়ান হোটেলও নেই তেমন। যাও বা একটা পাঞ্জাবি হোটেল আছে, তারা রুটি-পরোটা-তন্দুরিই করে। সঙ্গে হরেক সবজি আর মাংস। কিন্তু ভাতের কোনও সুবিধা সেখানে দেখেনি দীপ্র।

তুমি আমার সঙ্গে শিকাগো চলো, দেখবে কত রকমের কত চাল ওখানে। যেটা খুশি কিনবে। কথাটা বলেই মোবাথা প্যাটেল ব্রাদার্সের কথা তুলল। গুজরাতি দুই ভাই মিলে কীভাবে সারা আমেরিকা

boierpathshala.blogspot.com

জুড়ে ভারতীয় ফুড-চেইনের এক ঈর্ষণীয় সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে, মোবাথার মুখ থেকেই শুনছিল দীপ্র। মোবাথা অত গুজরাতি, বাঙালির তফাত বোঝে না, তাই বলে উঠল, ইউ ইন্ডিয়ান্স আর ভেরি এন্টারপ্রাইজিং। ওয়ান পারসন স্টার্টিং সামথিং অ্যান্ড এনক্লাইং সো মেনি কাস্ট্রিমেন..

দীপ্র চুপ করে গেল। বাঙালি হলে আরও অনেক বাঙালিকে দেশ থেকে নিয়ে এসে চাকরি দেওয়ার বদলে এখানে আসতে চাওয়ার ইচ্ছে রাখা লোক দেখলেই ডিসকারেজ করত। তবু যে বাঙালি, সে কীভাবে নিজের ভিতরের বাঙালিত্বকে অস্বীকার করে? দীপ্র তাই স্থানীয় ওয়ালমার্টের থেকে চাল কিনে নিয়ে এল এক প্যাকেট। কিন্তু তা ফুটিয়ে যা ভাত হল তা মালয়েশিয়ার রাবারের থেকেও শক্ত। শুধু কচকচ করে দাঁতে। নাম আর হয় না।

বিশাখার গলায়, 'আজ রাতটা একটু গরম ভাত আর পাঁঠার মাংস খেলে ভালো লাগত না?' শুনে তাই নিজেকে সামলাতে পারেনি ও। অবশ্য ওই ভদ্রমহিলা যদি উচ্ছেসেদ্ধ খাওয়ানোর জন্যও ডাকত দীপ্রকে, তবুও কি সেই ডাক উপেক্ষা করতে পারত দীপ্র!

অবশ্য তার আগে মান-অভিমানের সামান্য একটা ডকু-ফিচার ওই হোস্টেলের রিসেপশনেই হয়ে গিয়েছে। আর সেখানে গম্ভীর দীপ্রর দুটো হাত ধরে ক্ষমা চেয়েছে বিশাখা।

কিন্তু আপনি তো আমায় কিছু বলেননি।

জানি দীপ্র। দোষ বিশাখার নয় আমার। কিন্তু বিশাখাকে দু'-একজন এত ডিস্টার্ব করে যে আমি মাথা ঠিক রাখতে পারি না অ্যাট টাইমস। নিজেকে শান্তনু দত্ত বলে পরিচয় দেওয়া লোকটা বিশাখার পাশে দাঁড়িয়ে বলে উঠল।

দু'-একজন বিরক্ত করে বলে তুমি দীপ্রকেও তাদের দলে ফেলে দিলে। বলিহারি বুদ্ধি তোমার। বিশাখা বলে উঠল।

তোমার আমাকে আগেভাগে সতর্ক করা উচিত ছিল। আমি কী করে জানব যে এরকম একটা স্কলারের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে তোমার?

ঠিক আছে বউদি, আমার জন্য আপনাদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া লেগে যাক আমি চাই না। শান্তনুকে তেড়ে কাড়তে যাওয়া বিশাখাকে থামিয়ে দিল দীপ্র।

অ্যাই বউদি-ফউদি আবার কী? জাস্ট নাম ধরে ডাকবে ওকে। আমাকেও। শান্তনু দত্ত বলল।

আমি ভাই অত মড হতে পারব না। আর তাছাড়া আমার 'বউদি' ডাকটা ভারি মিষ্টি লাগে। তুমি আমাকে 'বিশাখাবউদি' বলেই ডেকো গো, দীপ্রর হাতটা ধরে বলে উঠেছিল বিশাখা।

ওদের বাড়ির দিকে রওনা হওয়ার পর, বাড়িতে পৌঁছেও সেই স্পর্শ জলতরঙ্গের মতো বাজছিল দীপ্রর তন্ত্রীতে।

...

প্রায় সত্তর মাইল পেরিয়ে যে বাড়িটায় এল দীপ্র, সেটাও আমেরিকার আর পাঁচটা বাড়ির মতোই। একটু সিমেন্ট-কংক্রিট আর অনেকটা কাঠ দিয়ে তৈরি। আলাদা বলতে তার পিছনের লনে নাকি মাঝে মাঝে হরিণ এসে ঘাস খেয়ে যায়। দীপ্রর অবশ্য তখন হরিণ দেখার মতো মন নেই। বিশাখার ঘোরই ওকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তবু তারই মধ্যে শান্তনুদার দিলখোলা কথাবলার স্টাইল ওর ভালো লাগছিল।

—আমেরিকাতে পা দেওয়ার মুহূর্তে থেকে বুঝে গিয়েছি যে, আমেরিকা আসলে স্বপ্নের দেশ নয়। পাগলের মতো খাটিয়ে নেওয়ার দেশ। এখানে বিপদে পড়লে 'নাইন-ওয়ান-ওয়ান' কল করতে হবে। ওই '৯১১'-ই এদেশের ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর। আলাস্কা হোক বা টেক্সাস, সেখানে ফোন করলেই একটা সিস্টেম ছুটে যাবে যে কোনও বিপন্ন মানুষকে উদ্ধার করতে। কিন্তু, ব্যক্তিগতভাবে কেউ হাত বাড়িয়ে দেবে তেমনটা ভেবো না। শান্তনুদা বলল, সিঙ্গল মল্টে বরফ দিতে দিতে।

—ছেলেটা নতুন এসেছে, ওকে ভয় দেখিও না। আর এমন মদও খাইয়ো না যে ও ডিনারটা এনজয় করতে না-পারে। বিশাখাবউদি বলল।

—আমি কিন্তু একদমই খাই না। দীপ্র বলল এতক্ষণে।

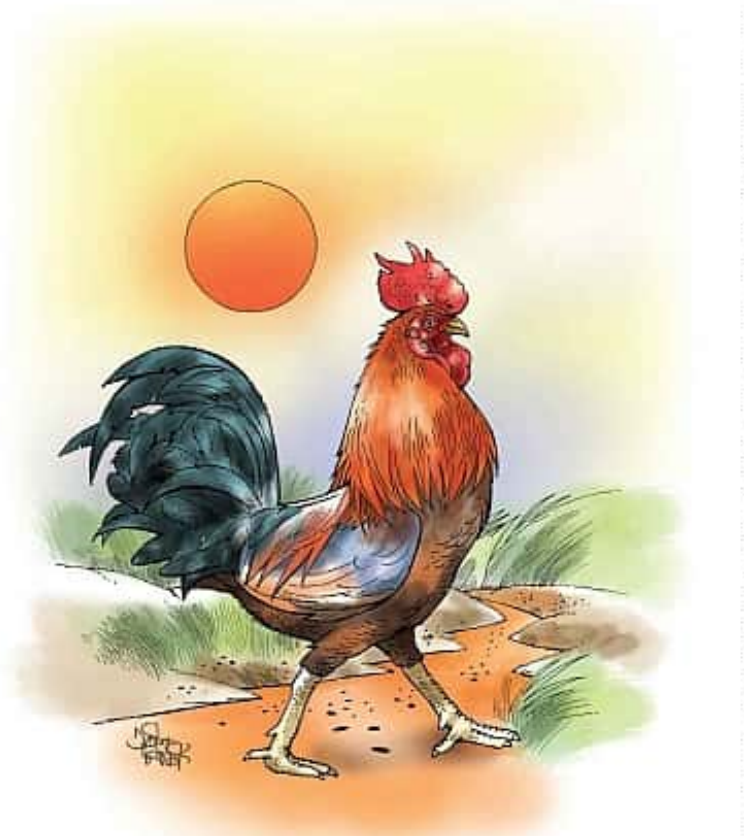

ঘরোয়া পোশাক বদলে বিশাখাবউদি একটা অফশোল্ডার গাউন পরেছে। চমৎকার লাগছে ওকে দূর থেকেও। কিন্তু, সেই গাউনটা যেন সবকিছু ঢেকে রাখতে পারছে না। যেভাবে ঘাসের ভেতর থেকে লাউডগা সাপ বেরিয়ে আসে সেভাবেই বউদির শরীরের একটা-আধটা অংশ বেরিয়ে পড়ার আভাস দিচ্ছিল। আচমকা সেই সাহেব উঠে দাঁড়াল আর বিশাখাবউদিও উঠে দাঁড়াল সেই মুহূর্তেই। সাহেব দু'-তিন পা এগিয়ে গিয়ে বউদিকে জড়িয়ে ধরে গালে-টালে নয়, একদম ঠোঁটেই চুমু খেল। খেতেই থাকল।

যাওনি সেটা বলো। স্টেটাসে এসেছ যখন, নতুন একটা দুটো জিনিস ট্রাই করতে হবে তো।

শান্তনু দত্তর কথা মধ্যে কেমন একটা ভাতের গন্ধ আর বাংলার আর্দ্রতা টের পাচ্ছিল দীপ্র। প্রথম আমেরিকায় এসে লোকটা নাকি লোক ডেকে ডেকে রাস্তা জিজ্ঞেস করত। তখন মোবাইল, গুগল ম্যাপ, গাড়ির ভিতরে বসে রাস্তা বাতলে দেওয়া নারীকণ্ঠ কিছুই আসেনি পৃথিবীতে।

শান্তনুদার কথার ভিতরেই বিশাখা এসে বলল, ডিনার রেডি।

বহুদিন পর অত তৃপ্তি করে খেল শান্তনু। আমেরিকায় আসার পর এই প্রথমবার।

—ভাতের প্রতি তোমার খুব প্রেম মনে হচ্ছে? খাওয়া শেষ হয়ে গেলে শান্তনুদা বলল।

—ভাতের প্রতি প্রেম কোন বাঙালির নেই বলুন তো? তবে ভবিষ্যতে যদি সায়েন্টিস্ট হিসেবে নাম করতে পারি তাহলে আত্মজীবনীর দুটো পাতা আপনাদের জন্য ছেড়ে রাখতেই হবে। আমেরিকায় এসে যখন 'ভাত-ভাত' করে প্রাণটা ওষ্ঠাগত হয়ে আছে, তখন আপনারাই প্রথম ভাত খাইয়েছিলেন। এই কথাটা লিখতে হবেই।

—তাহলে তোমার আত্মজীবনী কেউ পড়বে না। হেসে উঠল বিশাখাবউদি। আর ওর গাজরাঁটটা লুকনো টুনি বালবের মতো ঝলমল করে উঠল।

—শান্তনুদা জিজ্ঞেস করল, তাহলে কী লিখতে হবে?

—লিখতে হবে যে, তুমি ভাত খেতেই এসেছিলে আমাদের বাড়ি। কিন্তু তারপর শান্তনু অফিসের কাজে বাইরে গিয়েছে আর আমি একটা শর্টস পরে ঘুরছি দেখে ভাতের বদলে আমাকেই খেয়ে নিলে।

বিশাখাবউদির কথা শেষ হতেই শান্তনুদা জোরে হেসে উঠল। সেই হাসিতে যোগ দিয়ে বউদি বলল, এইটা যদি লিখতে পারো তাহলে তোমার গল্প একদম সুপারহিট।

দীপ্রর কান গরম হয়ে উঠল লজ্জায়। সেটা এতটাই যে পরদিন সন্ধ্যায় ওদের বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে মুখ তুলে তাকাতেই পারল না আর বাড়ির মালকিনের দিকে। আর আবারও প্রায় সত্তর মাইল ড্রাইভ করে দীপ্রকে হোস্টেলের সামনে নামিয়ে ফিরে যাওয়ার আগে যখন বরের পাশাপাশি বউও জড়িয়ে ধরল কিংবা বলা ভালো 'হাগ করল' আমেরিকান কায়দায়, ওর ভেতরে যেন একটা বিদ্যুতের প্রবাহ বয়ে গেল। মনে হল, বিশাখাবউদি যা বলছিল, সেরকম পরিস্থিতি হলে তেমন কিছু কি ঘটেও যেতে পারত?

মানুষ যা ভাবে তা যেমন একেকসময় সত্যি হয় তেমনই মানুষ যা কল্পনা করেনি তাও ঘটে কখনও-সখনও। নইলে শান্তনুদা আর বিশাখাবউদি, বিশেষ করে দ্বিতীয়জনের সঙ্গে ফোনে কথা বলা কেন একটা অভ্যাস হয়ে দাঁড়াবে দীপ্রর? কেন রিসার্চের প্রবল চাপের ভিতরেও প্রতি সপ্তাহে না-হলেও দু'সপ্তাহ অন্তর ছুটে যাবে ডি-ম্যোনে ওদের বাড়ি? ফেসবুকে সুচন্দ্রার মেসেজ আসছে দেখলেও এড়িয়ে যাবে। ফোন করা তো দূর, উত্তর দেওয়ার সৌজন্যটুকু পর্যন্ত দেখবে না অধিকাংশ সময়? সামনাসামনি একেবারে স্বাভাবিক আচরণ করে গেলেও ভিতরে ভিতরে প্রবল উত্তেজিত হবে বিশাখাবউদির কথা ভেবে? ইউনিভার্সিটি, কফিশপ, রাস্তায় যে-মেয়েই দেখুক, যত মেয়েই দেখুক, ঘুরে ফিরে একজনের কথাই মনে পড়বে? আর সেই মনে পড়া একইসঙ্গে প্রবল বাসনা আর অনেকটা নির্ভরতার উদ্রেক করবে?

কিন্তু সেই শনিবার যখন শান্তনুদা বেরিয়েছে একটা কোনও জরুরি কাজে আর ভরপেট খেয়ে দীপ্র ঘুমিয়ে আছে তখন হঠাৎ করে একটা আওয়াজে ওর ঘুমটা ভেঙে যাবে কেন? কেন ও যে ঘরে ঘুমোচ্ছিল, সেই ঘরের দরজা ফাঁক করতেই ওর চোখে পড়বে বসার ঘরে বিশাখাবৌদি আর একজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষকে?

ভদ্রলোক স্বাভাবিক গলাতেই দু'-চারটে কথা বলছিলেন আর বিশাখাবউদিও কে জানে কেন হেসে উঠেছিল প্রতিটি কথার পরেই। একটু আগের ঘরোয়া পোশাক বদলে বিশাখাবউদি একটা অফশোল্ডার গাউন পরেছে। চমৎকার লাগছে ওকে দূর থেকেও। কিন্তু, সেই গাউনটা যেন সবকিছু ঢেকে রাখতে পারছে না। যেভাবে ঘাসের ভেতর থেকে লাউডগা সাপ বেরিয়ে আসে সেভাবেই বউদির শরীরের একটা-আধটা অংশ বেরিয়ে পড়ার আভাস দিচ্ছিল। আচমকা সেই সাহেব উঠে দাঁড়াল আর বিশাখাবউদিও উঠে দাঁড়াল সেই মুহূর্তেই। সাহেব দু'-তিনপা এগিয়ে গিয়ে বউদিকে জড়িয়ে ধরে গালে-টালে নয়, একদম ঠোঁটেই চুমু খেল। খেতেই থাকল।

এ কী হচ্ছে? শান্তনুদা বাড়ি নেই আর সেই সুযোগে বিশাখাবউদি কী করছে এসব? চোখটা সরিয়ে নিয়েও দীপ্র আবার ওদিকেই তাকাল। আর তখনই দীপ্রর অসাবধানতায় একটা আওয়াজ হল ওর ঘরের দরজায়। সাহেব খেয়াল না-করলেও, বিশাখাবউদির চোখটাকে ঘুরে যেতে দেখল ও। আর তৎক্ষণাৎ ফাঁক করা দরজা থেকে সরে এসে আবার শুয়ে পড়ল বিছানায়।

মিনিট পনেরো পরেই ওই ঘরে ঢুকে দীপ্রর চুলে বিলি কেটে বিশাখাবউদি বলে উঠল, আর ঘুমনোর নাটক করতে হবে না। একটু আগেই তো আড়ি পাতছিলে।

—না মানে... দীপ্র লজ্জায় মাটিতে মিশে যাচ্ছিল।

—থাক, আর এক্সকিউজ দিতে হবে না। কিন্তু আড়ি পাতার কিছু ছিল না গো। তুমি সামনে এসে বললেও লোকটা আমায় ওভাবেই চুমু খেত। এদেশের কালচারে ওগুলো আটকায় না। তাই না?

—তাই বলে অন্যের স্ত্রীকে ওভাবে জড়িয়ে ধরে...

দীপ্রকে থামিয়ে দিয়ে বিশাখাবউদি কেমন একটা গলায় বলে উঠল, অন্যের বউকে সাহেব জড়িয়ে ধরেছে বলে আপত্তি, নাকি তুমি জড়িয়ে ধরতে পারছ না বলে মনখারাপ?

—কী বলছেন, আমি কিছু...

সব বুঝতে পারছ। আমি যেমন তোমার চোখ দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম প্রথম দিন। এসো, কেমন করে জড়িয়ে ধরতে হয় শিখিয়ে দিই। বলেই বিশাখাবউদি দীপ্রর ঘাড়ে-গলায় চুমু দিতে দিতে ওকে জড়িয়ে ধরল।

পলকের একটা ঘোর মানুষকে অবশ করে দেয়। কিন্তু, তার ভিতরেই ভিতরের সংস্কারবশত নিজেকে ছাড়িয়ে নিল দীপ্র।

সরে গেলে? ভাল লাগল না? মনের ইচ্ছা তো আঠারো আনা। বলতে বলতেই দীপ্রর কাছে এসে ওর ঠোঁটে একটা আলতো চুমু দিল বউদি। দীপ্র ঠোঁট দুটো চেপে রেখেছিল বলে, বুঝেও বুঝল না।

ঠোঁটদুটো ওরকম করে আছ কেন? তোমায় আমি বিষ খাওয়াচ্ছি নাকি? বিরক্ত গলায় বলে উঠল বউদি।

শান্তনুদা নিজের এক বন্ধুর কথা বলছিল, ফ্লোরিডার পেনসাকোলায় যার বাড়িটা নাকি পুরোটাই জলের ওপর। দীপ্রর মনে হল, এই বাড়িটাও তাই। কিংবা জল নয়, বিশাখা নামের একটা ঢেউয়ের ওপর দাঁড়িয়ে। ডোরবেল বেজে উঠল ঠিক তখনই।

(চলবে)

boierpathshala.blogspot.com

পর্ব ৮

থাকে শুধু অন্ধকার

■ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশাখাদিকউদি আর একবার দীপ্রকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল। তারপর ঝট করে নিজেকে আলগা করে নিয়ে দরজা খুলতে চলে গেল। যেতে যেতে দীপ্রর দিকে তাকিয়ে যে হাসিটা দিল তার মানে হয়তো কোনও অভিধানে নেই। তবু দীপ্র একটা মানে করল হাসিটার—'স্টে কুল'। কিন্তু একটা মেঘ আকাশ থেকে নেমে এসে ঘুঁড়ে দিলে, একটা ঢেউ নিজের দিকে টানলে কে আর পারে 'কুল' থাকতে? দীপ্র তাই ঘামছিল আর ঘরে ঢুকে সেটাই ঘোষাল করল শান্তনুদা।

—ব্যাপারটা কী, তুমি এই মিড-ওয়েস্টের ঠান্ডাতেও ঘামছ? শান্তনুদা জিজ্ঞেস করল।

—মিড-ওয়েস্টে কি ঘামা বারণ? দীপ্র কোনজরকমে বলল।

—তা নয়। কিন্তু, এখানে শীত এত প্রবল যে চট করে ঘামে না কেউ, ভীষণ উত্তেজিত না-হলে। তুমি কি উত্তেজিত?

দীপ্রর মনে হচ্ছিল যে, শান্তনুদা বোধহয় দৈবজ্ঞ। এতক্ষণ ওঁর অনুপস্থিতিতে এখানে কী হয়েছে বা হয়নি সবটাই জানে। আর তাই এমন করছে যার উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

—আহা, লোকে বুঝি শুধু উত্তেজিত হলেই ঘামে। অসুস্থ হলে ঘামে না। দীপ্রকে আড়াল করার জন্যই যেন বলল বিশাখাবউদি।

কিন্তু শান্তনুদা বলটা হাফভলিতে বাউন্ডারি পার করে বলল, দিব্যি সুস্থ ছেলে বেরোবার সময় দেখে গেলাম। তুমি ওকে লাঞ্চে কী খাওয়ালে যে অসুস্থ হয়ে পড়ল?

বিশাখাবউদি জোরে হেসে উঠল, সেটা ওকেই জিজ্ঞেস করো।

দীপ্র ধপ করে বসে পড়ল ডিভানে। তারপর অসহায়ের মতো তাকাল শান্তনুদার দিকে। পরের প্রশ্নবাণের জন্য।

শান্তনুদা অবশ্য ততক্ষণে হাসতে শুরু করে দিয়েছে।

১৫

আমার মনে হয় যে আপনার ছেলের আমাকে পছন্দ হয়নি। যদি হত, তাহলে কথাবার্তা বলত। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়া বাবাকে দেখতে ওদের বাড়িতে আসা দীপ্রর মাকে কথাগুলো বলে অস্তিবোধ করল সুচন্দ্রা। দীপ্রর মা একটু থমকে গিয়ে বললেন, না মানে, ও আসলে খুব লাজুক। মেয়েদের সঙ্গে খুব একটা... সুচন্দ্রা ওঁকে থামিয়ে দিয়ে বলল, লাজুক হলেও মেসেজ দেখে একটা উত্তর দেওয়া যায় তো, ফোন করার অসুবিধে থাকলেও। কিন্তু আপনার ছেলে সেটুকুও করেনি।

— থাক না এসব কথা এখন। উনি তোর বাবাকে দেখতে এসেছেন... সুচন্দ্রার মা ওকে থামানোর একটা চেষ্টা করলেন।

— উনি তো আর এমনি আমাদের বাড়িতে আসবেন না বা আমিও যাব না। তাই যখন দেখা হবে তখনই কথাগুলো বলতে হবে।

— তুমি বলতে পারো। আমি নিজেই এই ইনিশিয়েটিভটা নিয়েছি যখন, তোমার কোনও কথাই তখন এড়িয়ে যেতে পারি না। দীপ্রর মা থমথমে মুখে বললেন।

সুচন্দ্রার খারাপ লাগল। বলল, দেখুন একবারও ভাবলেন না যে আমি অ্যাক্টিভিজ করছি আপনাকে। কিন্তু আমার সত্যি মনে হয় যে আপনি একটা অনিচ্ছুক ঘোড়াকে টানতে টানতে জলের ধার অবধি নিয়ে যাচ্ছেন; এবার ঘোড়াটা না চাইলে জল খাওয়াবেন কী করে?

— আমার ছেলেকে আসলে আমি ঘোড়া বলে ভাবি না। আর ও যে অনিচ্ছুক তা তুমি নিশ্চিত হচ্ছো কী করে?

— মেয়েদের যে সিক্সথ সেন্স থাকে তা দিয়েই হচ্ছি। প্রথম দিন থেকে আপনার ছেলে কি এমন একটা কাজও করেছে, যার ভিত্তিতে বলতে পারি যে তার এই সম্পর্কটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র উৎসাহ আছে? দেখতে আসেনি, কথা বলেনি, মেসেজের উত্তরও দেয়নি। এর মানে কী? হি ইজ জাস্ট নট ইন্টারেস্টেড। আর যে আগ্রহী নয় তার পথ চেয়ে আমরাই বা বসে থাকব কেন?

— তুই এবার চুপ করবি। সুচন্দ্রার মা ধমকে উঠলেন।

— না, ও বলুক। ও তো ঠিকই বলছে। তবে আপনার মেয়ে যে এত স্পষ্ট কথা বলতে পারে, জানতাম না। দীপ্রর মা উঠে দাঁড়ালেন।

— ছি! ছি! এমন কথা শোনালি যে ভদ্রমহিলা মুখ কালো করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। তোর বাবাকে দেখতে এসেছিল, এতটা অভদ্রতা করা কি ঠিক হল? দীপ্রর মা চলে যেতে সুচন্দ্রার মা বলে উঠলেন।

—ভদ্রতা তো সারাজীবন সবার সঙ্গে করে এলাম মা। লাভ কী হল? আর তা ছাড়া কোনও অভদ্রতা আমি করিনি। বরং ওঁকে একটা জ্বালা থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছি।

—কীসের জ্বালা?

—যা হওয়ার নয়, তাকে হওয়ানোর চেষ্টা করার জ্বালা।

—তুই অনেক বদলে গিয়েছিস।

—তার দায় পরিস্থিতির মা। বাবার এরকম অবস্থা, কত টাকা ধার বাজারে, আরও কত টাকা ধার করতে হবে, তার নেই ঠিক। এখন মাবতীয় ভাবের কথা শুনলেই গা-পিত্তি চটে যায়।

—কিন্তু তুই আজ যা বললি তারপর তো এই সম্বন্ধ আর এগোবে বলে মনে হয় না। ওরা পিছিয়ে যাবে একদম।

—যাক না। আগু-পিছু না করে একেবারে পিছিয়ে যাক। তাতে ওদেরও শান্তি, আমাদেরও।

—কিন্তু তারপর?

—তারপর আবার কী? রোববারের কাগজে কিংবা কোন ম্যাট্রিমনিতে বিজ্ঞাপন দেব। যারা সত্যিই সিরিয়াস তাদের সঙ্গে যোগাযোগ হবে। আর আমাদের এই বিপদের সময়, যে ছেলেটার শক্ত কাঁধে মাথা রেখে ভরসা করতে পারব, তাকেই ভালোবাসব।

মা সামনে থেকে সরে যাওয়ার পর আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সুচন্দ্রা। নিজেকে দেখল অনেকক্ষণ ধরে। সত্যিই কি অনেকটা বদলে গিয়েছে ও? নাকি জীবনের ঝঞ্ঝায় টালমাটাল একটা মানুষ যেভাবে রিঅ্যাক্ট করে তাই করেছে শুধু?

মা কবছে ঠিকই করছে। ফেসবুকে কাল দীপ্রর যে ছবিগুলো ও দেখেছে তারপর ওর মার সঙ্গে অনর্থক কথা বাড়িয়ে লাভ নেই বলেই হচ্ছিল সুচন্দ্রার। আমেরিকায় অনেকেই যায়। তাই বলে, জলের ধারে বালিতে মেয়েদের পাশে নিয়ে ওরকম ছবি সব? সেগুলো আবার নিজের টাইমলাইনে শেয়ার করেছে? একেবারে উচ্ছন্নে গেল নাকি ছেলেটা? নাকি গিয়েই ছিল, সুচন্দ্রা জানত না?

মেয়েদের যে সিক্সথ সেন্স থাকে তা দিয়েই হচ্ছি। প্রথম দিন থেকে আপনার ছেলে কি এমন একটা কাজও করেছে, যার ভিত্তিতে বলতে পারি যে তার এই সম্পর্কটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র উৎসাহ আছে? দেখতে আসেনি, কথা বলেনি, মেসেজের উত্তরও দেয়নি। এর মানে কী? হি ইজ জাস্ট নট ইন্টারেস্টেড। আর যে আগ্রহী নয় তার পথ চেয়ে আমরাই বা বসে থাকব কেন?

boierpathshala.blogspot.com

কিন্তু জানার পরও অন্য যাকে পাশে পাবে, তাকেই ভালোবাসতে পারবে, এই কথাটা কি ঠিক বলেছে সুচন্দ্রা? ফেসবুকের ওই ছবিগুলোর কথা ভেবে তাহলে আবার ওর চোখ ফেটে জল আসছে কেন? কোন মায়ায় জড়িয়েছে ও যে একবারও না-দেখা একটা লোককে জীবনসঙ্গী হিসেবে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে মন?

ছটফটানির ভিতরেই মোবাইলের ডেটা কানেকশন অন করে ফেসবুকে ঢুকল সুচন্দ্রা। দীপ্রর প্রোফাইলে গিয়ে চোখ বন্ধ করে আবার খুলল। কিন্তু ছবিগুলো গেল কোথায়? একটাও দেখা যাচ্ছে না কেন? উড়িয়ে দিয়েছে?

১৬

আমি না-থাকলে পরে তুমি খেলিয়ে ভাত্তায় তুলতে পারবে তো? শান্তনু বিশাখার মাথাটা নিজের ঘামে ভেজা বুকে নিয়ে জিজ্ঞেস করল।

এতক্ষণের প্রেমযুদ্ধের শেষে কথা বলতে ভালো লাগছিল না বিশাখার। তবু অস্ফুটে বলল, হ্যাঁ।

—খুব চালাক কি?

সাদা চামড়ার লোকদের অত চট করে ধরা যায় না। আপাতভাবে যাকে স্বতস্ফূর্ত মনে হয় ভিতরে ভিতরে সেও হয়তো প্যাঁচ আঁটছে।

—ওরা প্যাঁচ আঁটে না। কীভাবে যেন, অম্যাদের প্যাঁচগুলো বুঝতে পেরে যায়। শান্তনু বলল। আসলে বিদ্যা-বুদ্ধি-বিচক্ষণতায় আমাদের থেকে অনেক এগিয়ে তো ওরা...

—কেন এগিয়ে বলো তো? ওরা সমস্ত কিছুতেই সায়েন্সের ওপর নির্ভর করে বলে একটা প্রিসিশন আসে ওদের কাজে। আর আমরা সমস্ত কাজেই আন্দাজে এগোই বলে ল্যাজেগোবরে হই।

—তুমিও আন্দাজে এগোও। তোমার সঙ্গে বাস করে আমার কিন্তু তা মনে হয় না। শান্তনু হেসে উঠল।

—কী মনে হয়, তনে? বিশাখা মুখ ঘষতে শুরু করল শান্তনুর বুকে।

—আগে বলো, প্যাট্রিককে পটালে কী করে?

—যার যেটা দুর্বলতা তার খোঁজ পেয়ে গেলেই তাকে ফাঁসানোটা সহজ হয়ে যায়। আগের সপ্তাহে মার্কের বাড়িতে আমি প্যাট্রিকের সেই দুর্বলতার খোঁজ পেয়ে গিয়েছিলাম। আগে জানা থাকলে পরে আমি আগেরবারই বশ করে ফেলতাম প্যাট্রিককে।

—দুর্বলতাটা কী সেটা বলবে তো? রাফ সেক্স? শান্তনু অধৈর্য হয়ে গেল।

বিশাখা হেসে ফেলল, আজে না। প্যাট্রিকের দুর্বলতা হচ্ছে বিশেষ ধরনের কালো বুদ্ধমূর্তি। এই মূর্তি সাধারণত তাইওয়ানে বেশি পাওয়া যায়। আর তা তিনেমাটির তৈরি হলেও, লাখ-লাখ ডলারে বিক্রি হয়, ওর স্পেশ্যালিটির জন্য। ও যখন মার্ককে দেখাচ্ছিল মোবাইল খুলে আমি আড়চোখে দেখছিলাম সেই বুদ্ধের চেহারা আর আকৃতি। দেখতে দেখতে মনে হল যে এইরকম বুদ্ধমূর্তি তো আমার কাছেই রয়েছে একটা। মুম্বইয়ের একটা বৌদ্ধমন্দিরের এক লামা আমায় দিয়েছিলেন। কিন্তু, তার রং তো কালো নয়।

কী করলে তবে?

— কী আর করব? কাগজ পুড়িয়ে ছাই বানিয়ে সেই রং আস্তে আস্তে ঘষলাম বুদ্ধদেবের গায়ে। অ্যান্ড হি টার্ন্ড ব্ল্যাক। প্যাট্রিক তো দেখে উল্লসিত। তখনই দেড়লাখ ডলার অফার করছিল আমায়। কিন্তু আমার এককথা, টাকা নিয়ে আমি এই বিক্রি করব না। দিতে হলে এমনই গিফট করব।

— কী বলল প্যাট্রিক, শুনে?

— ওই যে বললাম, সায়েন্সের দ্বারা চালিত হয় বেশিরভাগ সময়। সেটা একটা অসুবিধাও। জীবনের সূক্ষ্ম টানাপোড়েনগুলো বুঝতে পারে না। ঠাহর করতে পারছিল না, টাকা ছাড়া এই লেনদেন কীভাবে সম্ভব। আমি উঠে দাঁড়িয়ে কিস করলাম যখন, তখন ধাতস্থ হল একটু।

—শুধু কিস করলে, নাকি আরও কিছু? শান্তনু মজার টোনেই বলে উঠল।

—তাকে সমানে রেখে দশ লাখ ডলারের প্ল্যান করছি, তাকে আরও অনেককিছুই দেওয়া যায়। কিন্তু ঢাঁড়শকুমার দরজা ফাঁক করে দেখছিল তো। দেখতে গিয়ে হোঁচট-ফোঁচট খেয়ে আওয়াজ করে একদা। প্যাট্রিক বুঝতে পারেনি অবশ্য। কালো বুদ্ধমূর্তি পাওয়ার আনন্দে মশগুল ছিল এমনই।

—বাব্বা। আড়িপাতার স্বভাবও আছে? কথা বলে তো মনে হয়, ভাজা মাছটি উল্টে খেতে পারে না।

—আড়ি পাতবে বলে পাতছিল না। যতটুকু মনে হল, উঁকি না মেরে থাকতে পারেনি।

—আসলে তোমার প্রতি ছেলেটার একটা দুর্নিবার টান, তা আমি খেয়াল করেছি প্রথমদিন থেকেই। ও হয়তো এমনিই কোনও কথা বলছে, কিন্তু সামনে তুমি এসে দাঁড়ালেই অস্থির হয়ে যায় একেবারে। কী বলছে, কী করছে, খেয়াল রাখতে পারে না।

—কিন্তু আবার স্ট্যাচুও হয়ে যায়, আমি একটু এগোলে। ভয় আর ভক্তির মিশেল আর কী!

—না, শুধু ওই দুটোই নয়। সেদিন বার্ন লেকের ধারে কী করল ও? যে জায়গাটা চোরাবালি আছে বলে এড়িয়ে চলে লোক, সেখানে ছুটে গেল পাগলের মতো।

—আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম একটু, তাই খেয়াল করিনি।

—তোমার টপটা হাওয়া উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল

ওদিকে। আমি একবার বললাম যে, এখানে অ্যাসিস্ট্যান্টরা আছে, ওরাই কুড়িয়ে এনে দেবে, কিন্তু বাবু তো অপেক্ষা করতে প্রস্তুতই ছিলেন না। টপটা কুড়িয়ে নিয়ে এসে বিজয়গর্বে কপালের ঘাম মুছছিল। উফ, ওর সেই চেহারা যদি দেখতে।

—বিকিনি পরা আমার দিকে কীরকম ভূতগ্রস্তের মতো তাকিয়ে ছিল, সেটা দেখেছি।

—একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছে গো।

—সেটাই আমার মাথায় ঘুরছে। আর ঘুরছে বলেই জিজ্ঞাসা করছি, একটা ঝরনা যদি পাহাড়ে জন্ম নিয়ে তীব্র বেগে ছুটে আসতে চায় সমতলের দিকে তাহলে সেই ঝরনাকে আটকানো উচিত কি?

—একেবারেই নয়, বরং সে যাতে নদী হতে পারে তার ব্যবস্থা করা উচিত। জাস্ট পরিচয়টা বদলে দেওয়া দরকার। আর সেটা কীভাবে হয়, তুমি তো জানোই। হেসে উঠল শান্তনু।

হাসিটা একেবারেই স্বাভাবিক হয়তো, তবু খারাপ লাগল বিশাখার। একটা পরিচয় থেকে অন্য একটা পরিচয়ে পরিচিত হতে মানুষকে কী যন্ত্রণার ভিতর দিয়ে যেতে হয়, কীরকম আঘাত সামলাতে হয়, সবচেয়ে বড় কথা নিজের মুখোমুখি হলেই স্মৃতির ভিতর থেকে কতখানি অপমান এসে ধাক্কা মারে, তার কোনও ধারণা অন্য কেউ করতে পারে কি?

—কী হল, চুপ করে গেলে?

—না ভাবছি। আচ্ছা শান্তনু, তোমার চাকরি যদি চলে না-যেত, ব্যবসা করতে গিয়ে যদি ফেল না-করতে তাহলে এসবের ভিতর দিয়ে যাওয়ার আর কোনও দরকার পড়ত কি?

—এসব ভেবে নিজের মনকে দুর্বল করার কোনও মানেই হয় না এখন। যখন একটা কাজে নেমে পড়েছি, টার্গেট ঠিক করেছি, তখন পিছিয়ে আসার কথা ভাবাই অন্যায়। আর ঝড়ের ভিতর দিয়ে তুমি একাই যাবে না, আমাকে তার দ্বিগুণ ঝড় সামলাতে হবে, তোমার থেকে দূরে থাকতে হবে, অ্যান্ড ইউ নো, আমার জন্য সেটা কতটা ডিফিকাল্ট।

—জানি। কিন্তু বারবার এই ডিফিকাল্টিসগুলো পেরনোর চেষ্টায় ক্লান্ত হয়ে পড়ছি।

—বারবার নয় সোনা। জাস্ট একবার। এই একবারের পর আর কোনওদিন ট্রাবলের মুখোমুখি হওয়ার দরকারই পড়বে না আমাদের। তুমি দেখে নিও।

—না একবার নয়। বিশাখা উঠে বসল।

—মানে?

—বলছি, একটিলে দুই পাখি মারার মতো, এই একটা সমস্যাকে আমরা দু'দিক দিয়ে কাজে লাগাব। যে এসে দাঁড়িয়েছে সে তো বটেই, যে আসার জন্য ছটফট করছে তাকেও কাছে টানতে হবে।

—আমি মাথামুণ্ডু বুঝতে পারছি না, তোমার কথার। শান্তনু হতাশ গলায় বলে উঠল।

—তুমি কবেই বা কিছু বুঝেছ, প্রথমবারে? দরকার নেই বোঝার, যখন যেমন প্রয়োজন হবে, আমি বুঝিয়ে দেব। কিন্তু ফার্স্ট অফ অল তুমি কাল সকালেই একটা ফোন করবে দীপ্রকে। না ছাড়ো, আমিই করব।

—কী বলবে, ফোন করে?

—সেটা যখন ফোন করব, তখনই দেখবে।

—একটু বলেই না ডার্লিং।

—ঝরনাটাকে নদী বানাতে হবে গো। নইলে আমাদের আর সমুদ্র হওয়া হয়ে উঠবে না। হেসে উঠল বিশাখা। শান্তনু ওকে আবারও কাছে টানতে গিয়ে, থমকে গেল।

১৭

দীপ্রর মাথা দপদপ করছিল। কী ঝগড়াটি মেয়ে রে বাবা। আর মা বলছিল, সাত চড়ে নাকি রা কাড়ে না। হ্যাঁ, বেশ করেছে দীপ্র বিকিনি পরা মহিলাদের মধ্যে ওর নিজের ছবি দিয়েছে। আমেরিকায় মেম হোক কিংবা বাঙালি, আধহাত ঘোমটা দিয়ে তো ঘুরবে না। সানবাথ নিতে গেলে, বিকিনি পরেই ঘুরবে। তাতে আরও কোনও অসুবিধে হলে, সে দেখবে না সেই ছবি। খামোখা ফেসবুকে এসে, 'হাফ নেকড়েদের ভিড়ে, আপনি ফুল নেকড়ে হয়ে ঘুরলেই বেশি মানাত মনে হয়' কমেন্ট করে যাওয়ার মানে কী? তখনই সুচন্দ্রাকে ব্লক করে দেবে ভেবেছিল দীপ্র। কিন্তু রাগ যখন মাথায় ওঠে তখন কোথাও তার একটা বেরিয়ে যাওয়ারও পথ চাই। দীপ্র তাই সুচন্দ্রার নম্বর খুঁজে বের করে একটা ফোনই করে বসল। আর যত তীব্র গলায় এক্সপ্ল্যানেশন চাইল ওই কমেন্টটার, ততোধিক তীব্র গলায় মেয়েটা দায়ী করে গেল ওকে।

এই মেয়ের সঙ্গে মা ওর বিয়ে ঠিক করেছিল? এ তো জীবনে এলে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দিত দীপ্রকে। মাকে ফোন করে এক্ষুনি পুরো ব্যাপারটা জানাতে হবে ভেবেও চুপ করে গেল। ওই বিকিনি পরা মেমদের মাঝে দীপ্রর ছবি মা ঠিকভাবে নেবে কি? যদি বা নেয়, ওই দঙ্গলের মধ্যে বিশাখাবউদিকে দেখলে দুশ্চিন্তা হবে না মার? জানতে চাইবে না কে ওই বাঙালি মেয়েটা যে মেমদের মতোই সাহসিনী? কী জবাব দেবে তখন দীপ্র? কেমন করে বোঝাবে ওর আর বিশাখাবউদির সম্পর্কটা ঠিক কী?

তার চেয়ে এই ছবিটায় দেয়ালিকেও কাস্টম করে দেওয়া ভালো। মা অবধি পৌঁছতেই পারবে না ছবিটা। জীবনে কয়েকটা জিনিস নিজের কাছেই রাখতে হয়, নাহলে অনর্থক জবাবদিহির মুখে পড়তে হয়। কিন্তু, সুচন্দ্রা কি এই ছবির কথা মাকে জানাবে? মনে হয় না। তবু রিস্ক নিয়ে লাভ কী? ভেবে, পোস্টটাই ডিলিট করে দিল দীপ্র। এই প্রচণ্ড কাজের প্রেশারে ও কতক্ষণ আর ফেসবুকে থাকতে পারে? যেটুকু সময় আসে, অশান্তির দরকার নেই আর। তাছাড়া বিশাখাবউদি একজন বিবাহিত মহিলা। দীপ্র যতই চাক, দীপ্রর কাছে নিজেকে নিশ্চয়ই বিলিয়ে দেবেন না উনি। আর দিলেও কি সংশয়রহিত হয়ে গ্রহণ করতে পারবে দীপ্র?

চোখটা লেগে গিয়েছিল। ছোট্ট একটা স্বপ্নে দীপ্র দেখল যে, বিশাখাবউদি জিজ্ঞেস করছে, পিকনিকে এসে কেমন লেগেছে দীপ্রর। আর দীপ্র কোনও জবাব দেওয়ার আগেই সরে যাচ্ছে সামনে থেকে। টপটা হাতে নিয়ে বিশাখাবউদির পেছনে দৌড়চ্ছে দীপ্র, কিন্তু কিছুতেই ধুঁতে পারছে না ভদ্রমহিলাকে। উনি এগিয়ে যাচ্ছেন ক্রমাগতই।

ফোনের শব্দে ঘুমটা ভেঙে যেতেই দীপ্র দেখল দুটো মিসড কল বিশাখাবউদির। দীপ্র রিংব্যাক করল।

—কী গো পিকনিকে নিয়ে গিয়েছিলাম বলে, নাকি বাড়িতে সেদিন আপ্যায়নের ত্রুটি হয়েছিল বলে রেগে আছ? বিশাখাবউদি বলল।

—তেমন কিছুই নয়। কাজের চাপ চলছে প্রচণ্ড। দীপ্র উত্তর দিল।

—ওসব তোমার অজুহাত। আর ওই অজুহাতে যেই ভুলুক, আমি ভুলছি না।

—আমি সত্যিই বলছি।

—আহা আমি যেন মিথ্যে বলছি। বিশাখাবউদি হেসে উঠল ফোনের ওপারে।

সেই হাসি যখন ফার্নেসে পড়া লোহার খাড়ার মতো গলিয়ে দিচ্ছে দীপ্রকে তখনই বিশাখাবউদি তিরটা চালাল।

—আমি যদি চাই তাহলে, তুমি আমার একটা রিকোয়েস্ট রাখবে গো?

—কী রিকোয়েস্ট বলবে তো। দীপ্র বলল।

—'হ্যাঁ' বলার আগে কী চাইছি সেটা জেনে নিতে হবে? না গো এত হিসেবি হয়েছে জানলে ফোন করতাম না তোমাকে।

—সরি বউদি। আমি এত কিছু মিন করে বলিনি। তুমি বলো না, কী বলছ।

—বলছি তোমার দাদা মাসখানেকের জন্য আমেরিকার বাইরে যাচ্ছে, কাজে। ইন্ডিয়াতেও ঘুরে আসবে হয়তো।

—হঠাৎ?

—জরুরি কাজ পড়ে গিয়েছে। কী করবে?

—ও আচ্ছা, তা তুমি যাচ্ছ সঙ্গে?

—না গো আমি যেতে পারছি না। কিন্তু তোমায় যদি বলি তবে, তুমি যাবে দাদার সঙ্গে?

(চলবে)

boierpathshala.blogspot.com

পর্ব ৯

থাকে শুধু অন্ধকার

■ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

তুমি আমার কাছে এলে যদি আমি তোমায় স্নান করিয়ে দিই একদিন, তোমার রিসার্চের ক্ষতি হয়ে যাবে? যেদিনগুলো তুমি আমার কাছে থাকবে, সেই দিনগুলো নয় কিন্তু যেদিন তুমি ডি-ময়েন থেকে অ্যামেসে ফিরে যাবে আবার, তখন? তাহলে সাবানের সঙ্গে আমার গন্ধটাও তোমার কাছে থেকে যাবে যতদিন না তুমি আবার আমার কাছে ফিরে আসছ।

না বউদি, আমার এখন যা ধোপার তাতে আমার পক্ষে একমাস কেন এক সপ্তাহের জন্য বাইরে যাওয়াও মুশকিল।

—একদিনের জন্য যে বলোনি, তাতেই আমি কৃতার্থ। বিশাখাবউদি হেসে উঠল ফোনের ওপারে।

—তুমি কেন বুঝছ না আমি জানি না। এই দেশটার হাল-হকিকত তোমাদের তো অজানা নয়। ইন্ডিয়াতে একটা ধোপার সাবমিট করে হাতে দিয়ে পড়ে থাকতে হত। তিনবার গাইডকে খুঁচিয়ে তবে একটা লাসসারা অবাব মিলত। আর এখানে রাতে মেইল করে ভোর সাতটার মধ্যে উত্তর পেয়ে যাচ্ছি। কলকাতায় কেউ বেশি কাজ করালে অন্যরা তার ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে যেত আর এখানে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত সবাই এতটাই খাটছে যে ওদের সঙ্গে তাল মেলাতে গেলে আমাকেও গয়াংগজ্জ মনোভাব ছেড়ে দিয়ে...

—একেবারে মেশিন হয়ে উঠতে হবে। তাই না? বিশাখাবউদি বলে উঠল।

—তুমি এভাবে ভাবলে আমার কিছু করার নেই। কিন্তু ব্যাপারটা আসলে তা নয়।

—ব্যাপারটা কী, তা বোকার মতো বুদ্ধি আমার আছে দীপ্র। কিন্তু সত্যিটা হল তুমি আমার থেকে পালাতে চাইছ।

—এসব কী বলছ? তুমি আর শান্তনুদা কত ভালোবেসেছ আমায়। কত আতিথ্য পেয়েছি তোমাদের বাড়ি গেলেই। আমার তো তেমন কেউ পরিচিতই নেই আমেরিকার বাঙালিদের মধ্যে। তোমরাই বন্ধু, তোমরাই আত্মীয়।

—বাজে কথা রাখো। আমি 'আমাদের' কথা বলছি না। বলছি যে তুমি আমাকে এড়াতে চাইছ। অস্বীকার করতে পারো?

—কেন এড়াতে চাইব তোমায় আমি?

—কারণ, তুমি আমাকে ডিজায়ার করো। আর ডিজায়ার করেও যাকে পায় না, তার থেকে পালাতে চায় মানুষ।

—ছি! ছি! এভাবে আমি ভাবিনি কখনও।

—তুমি ভুলে যেও না দীপ্র, মেয়েদের একটা সিক্সথ সেন্স থাকে। যেদিন বার্ন লেক ঘুরতে গিয়েছিলাম, আমরা সেদিন আমার টপটা কুড়িয়ে আনতে তুমি চোরাবালিতে ছুটে যাওনি?

—সে তো আমি ততটা জানতাম না...

—শান্তনু বারণ করলেও তুমি ছুটে গিয়েছিলে। আর সেদিনের কথা যদি বাদও দিই। আমার বাড়িতে যতবার এসেছ, আমি তোমার চোখে একটা প্রবল ইচ্ছা দেখেছি আমায় পাওয়ার।

—আই অ্যাম সরি বউদি, আমি...

—সরি কেন দীপ্র? দরজা ফাঁক করে আমাকে আর ওই সাহেবকে চুমু খেতে দেখছিলে বলে? আরে বাবা ওতে কিছু অন্যায় হয়নি। অন্যায় কীসে হয়েছে জানো? যখন আমি চান্স দেওয়ার পরও তুমি আমাকে চুমু খেতে পারলে না। কেন পারলে না? তুমি জানো না, একজন সুপুরুষ আমায় কামনা করছে এর থেকে বড় 'ফিল গুড' ফ্যাক্টর একটা মেয়ের জীবনে আর হতেই পারে না? সেই পুরুষ তাকে যতটা চায়, মেয়েটা তার তিনগুণ চাইতে থাকে লোকটাকে। মুখে বলে না অ্যাস্ট। এইটা না বোকার মতো আনাড়ি তো তুমি নও...

—বউদি আমাকে একবার ল্যাবে যেতেই হবে এখন। আমি পরে তোমার সঙ্গে...

—ভয় পেয়ে পালিয়ে যেতে চাইছ? হেসে উঠল বিশাখাবউদি।

—ভয় পাওয়ার মতো কী করেছি? দীপ্র প্রতিবাদ করার একটা চেষ্টা করল।

—আমি তো চাই তুমি করো। এমন কিছু করো যেটা দুঃসাহসিক। যা করতে সাধারণ লোক ভয় পাবে। কিন্তু তুমি পারে না। তবেই তো তুমি আমার হিরো, আমার সুপারম্যান হবে, তাই না?

—আমি অনেক কষ্টে আমেরিকায় এসেছি। আমাকে এখানে রিসার্চ কমপ্লিট করতে হবে, একটা চাকরি জোগাড় করতে হবে।

—তারপর দেশ থেকে একটা লাল-টুকটুকে মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে এসে, তার সঙ্গে জমিয়ে সংসার করতে হবে, তাই তো?

—অতদূর এখনও ভেবে উঠতে পারিনি।

—কিন্তু আমি যখন বিকিনি পরে শুয়েছিলাম বিচে তখন আমার দিকে যে মুগ্ধতায় তাকিয়েছিলে অন্য কাউকে সেই একই মুগ্ধতায় দেখতে পারবে?

—কখন তাকালাম?

—একদম ন্যাকামো করবে না, সারাক্ষণ আড়চোখে তাকিয়েছিলে। আর আমি ঘুরে তাকালেই চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছিলে। কিন্তু তাতে আমি রাগ করিনি, খুশিই হয়েছি। তোমার দাদার সঙ্গে তুমি আমেরিকার বাইরে যেতে চাও না শুনে যেমন খুশি হলাম।

—মানে? তুমিই তো একটু আগে রিকোয়েস্ট করালে আমায় যেতে।

—সে তো তোমায় একটু বাজিয়ে দেখার জন্য। আসলে তো আমি চাই, শান্তনু যে সময়টা ইউএসএ-তে থাকবে না, সেই সময়টা তুমি আমার কাছে থাকো।

—হোয়াট?

—চমকাবার কিছু হয়নি দীপ্র। তোমার যেমন আমাকে দেখলে গোপনে নাল গড়িয়ে পড়ে মুখ দিয়ে, আন্ড ডোন্ট ডিনাই দ্যাট, আমারও তো ভাল লাগে তোমায়। কিন্তু আমাদের দু'জনের মধ্যে একটা বেসিক তফাত আছে।

—কী তফাত বউদি?

—তুমি চাইলেও মুখ ফুটে বলতে পারো না। আর আমি আমার মনের ইচ্ছেটা খোলাখুলি এক্সপ্রেস করতে পারি। তাই শান্তনু যে সময়টা থাকবে না তখন তোমায় আমার কাছে থাকতে বললাম। এখন প্লিজ আবার কাজের কথা তুলো না। তোমার ডাকে সাড়া যে দিচ্ছে তাকে সম্মান করাটাও তোমার একটা কাজ। নয় কি?

—আমার সত্যিই দেরি হয়ে যাচ্ছে বউদি... আমাকে স্নান করেই ছুটতে হবে ল্যাবে।

—তুমি আমার কাছে এলে যদি আমি তোমায় স্নান করিয়ে দিই একদিন, তোমার রিসার্চের ক্ষতি হয়ে যাবে। যেদিনগুলো তুমি আমার কাছে থাকবে, সেই দিনগুলো নয় কিন্তু যেদিন তুমি ডি-ময়েন থেকে অ্যামেসে ফিরে যাবে আবার, তখন? তাহলে সাবানের সঙ্গে আমার গন্ধটাও তোমার কাছে থেকে যাবে যতদিন না তুমি আবার আমার কাছে ফিরে আসছ।

—আমি রাখছি।

—রেখো না, প্লিজ! কী অসুবিধে হচ্ছে তোমার? বুক ধড়ফড় করছে? মাথা ঘুরছে? সব সমস্যা আমি সারিয়ে দেব, তুমি এসো আমার কাছে। আমি যে এই নির্বান্ধব দেশে তোমার মতো কারও শখ চেয়েই বসে ছিলাম দীপ্র।

—শান্তনুদা কি শুধু ইন্ডিয়াতেই যাবে? না, অন্য দেশ আছে এবারের ট্রাভেল লিস্টে?

boierpathshala.blogspot.com

—সেই খোঁজে তোমার কী দরকার? যে চুলোয় ইচ্ছে যাক। আর শান্তনু ফিরে আসার অনেক আগে আমি তোমায় সতর্ক করে দেব, নিশ্চিন্ত থাকো। অবশ্য সতর্ক হওয়ারই বা কী দরকার তোমার? শান্তনু ফিরে আসলেই কি আমি তোমায় ভাগিয়ে দেব নাকি?

—বাট হি ইজ ইয়োর হাজব্যান্ড।

—তাতে কী দীপ্র? একটা মেয়ে কি শুধু তার বরের সম্পত্তি? তার মন কি একটা ব্রোঞ্জের স্ট্যাচু যে একবার ঢালাই হয়ে গেলে আর অন্য কোনও চেহারা নিতে পারবে না?

—আমি কিছু ভাবতে পারছি না বউদি...

—ভাবার কাজটা আমার ওপরই ছেড়ে দাও দীপ্র। ওটা আমি অনেকের থেকে ভালো পারি। তুমি শুধু বলো, আমি যা বলছি, বলে যাচ্ছি, তা তোমার চাওয়ার সঙ্গে মিলছে কি না।

—কিন্তু এতে পাপ হবে না?

—তুমি যখন মাকরাতে আমায় ভেবে ছটফট করো তখন পাপ হয় না? মনে মনে সারাক্ষণ ভাবছি তাতে পাপ নেই, আর বাস্তবে একবার ঘটলেই পাপ? কে তৈরি করেছে এইসব সংজ্ঞা? আজকের দিনে দাঁড়িয়ে সেসবের মানেই বা কী? তাছাড়া শুধু আজকে বলে নয়, দ্রৌপদী যখন এক স্বামীর ঘর থেকে বেরিয়ে অন্য স্বামীর ঘরে গিয়ে ঢুকত, কুন্তী যখন এক দেবতার পর অন্য দেবতাকে ডাকত, পাপ হত তখন?

—জানি না। সত্যিই জানি না।

—জানার দরকার নেই তোমার। শুধু ওই বস্তাপচা ভাবনা সরাও মাথা থেকে। আর আমার কথাগুলোকে একদম মাথায় গেঁথে নাও, মিশিয়ে নাও শ্বাসে-প্রশ্বাসে। তবেই তো যখন তুমি কাছে আসবে তখন আমরা একে অন্যের মধ্যে মিশে যেতে পারব সহজে। হাওয়ায় আর্দ্রতা যেভাবে মেশে। পারুল হবে না দীপ্র? দীপ্র ফোনটা ধরে বোবার মতো চুপ করে রইল। কোনও উত্তর জেগাল না ওর মুখে।

—কী হল বলো? ওপাশ থেকে বিশাখাবউদি বলে উঠল।

১৮

লি ইউ শানের সঙ্গে দীপ্রর আলাপ মোবাথার সূত্রে। খুব হাসিখুশি ছেলে, হেয়ফুলও। ছেলেটার গার্লফ্রেন্ডের নাম টং হং। মেয়েটা আইওয়া সিটিতে থাকে। আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়েই পড়ে। সেখান থেকে প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করলে বলে উইকএন্ডে অ্যামেসে চলে আসে। মাঝেমাঝে লি-ও যায় ওর কাছে। আর ওরা দু'জন একসঙ্গে হলেই হাসি-ঠাট্টা গানে-গল্পে মেতে ওঠে। প্রেমিক-প্রেমিকা কম বন্ধুই বেশি মনে হয়। টং হং অ্যামেসে এলেই মোবাথা, দীপ্র আর আরও কাউকে কাউকে কাছে ডেকে নেয় ওরা।

কলকাতায় একটা ধারণা আছে, বাঙালিরাই একমাত্র আড্ডা দিতে পারে। বাইরে এলে বোঝা যায় সেটা কতটা ভুল। বরং বেশি কথা বলতে পারত না বলে যে দীপ্র কলকাতায় ওইসব আড্ডা এড়িয়ে চলত, সেও অ্যামেসে এসে আড্ডার জন্য মুখিয়ে থাকে।

তার একটা অন্য কারণও আছে অবশ্য। কলকাতার অধিকাংশ আড্ডাই একটা সময়ের পরে পরনিন্দা-পরচর্চায় আসরে পরিণত হয়। একসঙ্গে বসে থাকা চারটে লোকের মধ্যে একজন উঠে গেলেই বাকি তিনজন তার নিন্দা শুরু করে। আর সেই আসরে যে চুপ করে বসে থাকে তাকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করে বাকিরা। অথচ এখানে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা। প্রতিটা আড্ডাই এখানে নতুন কিছু শেখার, জানার ব্যবস্থা করে দেয়। একটা নতুন জানলা খুলে দিয়ে রোদে ভাসিয়ে দেয়। লি শান ইউ আর ওর প্রেমিকা টং হংই যেমন গল্পে-গল্পে চিনে ভাষাটা তুলে ধরেছিল দীপ্র আর মোবাথার সামনে। দীপ্র আশ্চর্য হয়ে শুনেছিল যে ভাষাটায় প্রত্যেকটা অক্ষরই আসলে একটা ছবি। 'ভালোবাসা' একটা ছবি, 'আমি' একটা ছবি, 'তুমি' অন্য একটা ছবি। এবার, 'আমি তোমায় ভালোবাসি' বলতেই পারে কেউ। কিন্তু 'আমি তোমায় ভালোবাসব' কিংবা 'আমি তোমায় ভালোবাসতাম' বলবে কী করে? বলতে গেলে সামনে, 'গতকাল' কিংবা 'আগামীকাল' জুড়তে হবে। অদ্ভুত ভাষা। 'টেন্স'-এর ব্যবহার যেখানে খুবই সীমিত। তাই কি যুগের পর যুগ, সময় নিরপেক্ষভাবে চিনেরা এতটা পরিশ্রমী, এমনই একমুখী?

—বাইরে থেকে ওরকম মনে হয়। ওরাও মনে-মনে কষ্টে গুমরে মরে। মোবাথা বলল একদিন।

—চিন এখন বিশ্বের একনম্বর ইকনমি। আমেরিকাতেও যেখানে যা দেখছি, সবই 'মেড ইন চায়না'। ওদের সুখ কীসের? দীপ্র অবাকই হল একটু।

—মানুষের মনেও যদি এরকম একটা 'মেড ইন...' স্ট্যাম্প লাগিয়ে দেওয়া যেত তাহলে তো কোনও ঝামেলাই থাকত না। কিন্তু মানুষের মন তো রকেটের চেয়ে দ্রুত ছোটে, তাই না? টং হং তাই ওর জেলবন্দি বাবার কাছে পৌঁছে যায় প্রতিটা সন্ধ্যায়।

—ওর বাবা জেলে কেন?

—সরকারের বিরুদ্ধে লেখার অপরাধে। জাস্ট কয়েকটা আর্টিকল লিখেছিলেন। কিন্তু সেটুকু সমালোচনা সহ্য করার মতো উদারতাও চিনা সরকারের নেই। নামেই সুপারপাওয়ার, আসলে ইঁদুরের চেয়েও ভিতু।

ইঁদুর কি সত্যিই ভিতু? দীপ্র নিজেকে জিজ্ঞেস করল একবার। উত্তর পেল না। কিন্তু টং হঙয়ের মুখোমুখি যেদিন হল আবার, ওর গল্প শুনে প্রশ্ন করার সাহস উবে গেল ভিতর থেকে।

—তিয়েনআনমেনে যাদের গুলি করে মারা হয়েছিল তাদের অনেকের ওয়াইফ বা লাভারকে ধরে নিয়ে গিয়ে টায়লেট না-থাকা ঘরে আটকে রাখা হয়েছিল, কাউকে কাউকে গারবেজে মুখ দিতেও বাধ্য করা হয়েছে। তবু ওরা কেউ মাথা নোয়ায়নি, প্রচণ্ড চাপের মুখে দাঁড়িয়েও নিজেদের বয়ফ্রেন্ড বা বরদের অপরাধী বলে মেনে নেয়নি।

—কোনও বিরোধী গলাই অ্যালাউড নয় তোমাদের দেশে? মোবাথা জিজ্ঞেস করল।

—না নয়। তাই তো ওটা আর আমার দেশ নয়। আমি যেখানে চলে আসতে পেরেছি, যে আমেরিকা আমায় আশ্রয় দিয়েছে সেই আমেরিকাই আমার দেশ। কিন্তু...

টং হঙের গলা আবেগে রুদ্ধ হয়ে যেতে লি বলে উঠল, টং ওর বাবাকে ভীষণ ভালোবাসে। কিন্তু চাইনিজ ড্রাগনগুলো লোকটাকে আটকে রেখেছে অকারণে। ভদ্রলোকের ক্যানসার হয়েছে, ওঁর জীবনের আর অল্প ক'দিনই বাকি...

—সেদিন অবধি ওরা বাবাকে ছাড়বে না। একমাত্র মৃত্যু হলে তবেই বাবা জেলের বাইরে আসতে পারবে।

—কোনও প্রতিকার নেই? কারও কাছে প্রতিবাদ করা যাবে না? মোবাথা বলল।

—প্রতিবাদ, প্রতিকার গণতন্ত্রে হয়। যেখানে সরকারও আছে, বিরোধীরাও আছে। যেখানে পার্টিই সরকার আবার সরকারই পার্টি, সেখানে প্রতিবাদের জায়গাটা কোথায়? লি বলল।

দীপ্রর মনে হল, ভারতের এত যে সমালোচনা, ভারতে তো সরকারি ভর্তুকিতে পঞ্চাশ টাকা মাইনে দিয়ে ইউনিভার্সিটিতে পড়েও রাষ্ট্রের বাপোদ্ধার করা যায়। যারা করে তাদের যদি কয়েকদিনের জন্য চিনে পাঠিয়ে দেওয়া যায় তাহলে কেমন হয়?

—গণতন্ত্রের ন্যূনতম শর্ত যে দেশটা মানে না, সে আবার বিশ্বের কোথায় মানবাধিকার লঙ্ঘন হল তাই নিয়ে বড় বড় লেকচার দেয়। টং হং বলল।

দীপ্রর ভাল লাগছিল না এইসব যন্ত্রণার ইতিকথা। তবু একদম চুপ করে থাকলে খারাপ দেখায় বলে জিজ্ঞেস করল, তিয়েন-আন মেনে যাদের গুলি করে মারা হয়েছে তাদের বউ কিংবা গার্লফ্রেন্ডরা এখন নিশ্চয়ই মুক্তি পেয়ে গিয়েছে?

—অনেকে পেয়েছে, অনেকে পায়নি। কিন্তু মুক্তি পেলেই বা কী? ওদের জীবনটাই তো নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। টং হং বলল।

—ওরা কি আর কোনও রিলেশনশিপে যায়নি? মোবাথা জানতে চাইল।

লি জবাব দিল, বেশিরভাগই না। আসলে ওরা পোড়া কয়লার মতো হয়ে গিয়েছে। ওদের ভিতরের স্পিরিটটাকেই নৃশংস অত্যাচারে মেরে ফেলা হয়েছে।

—নট অনলি দ্যাট। ওরা ওদের ভালোবাসার সঙ্গে আছে। ওদের মধ্যে অনেককেই পুলিশ কিংবা পার্টির লোকেরাও বিয়ে করতে চেয়েছিল। কেন চেয়েছিল? আউট অফ লাস্ট। কিন্তু কামনা কি কখনও ভালবাসার বিকল্প হতে পারে? টং হং এই প্রথম লি'র সঙ্গে মেলে না এমন কথা বলল।

—কিন্তু প্রেমিকই তো বেঁচে নেই। তাহলে ভালোবাসা কীভাবে? দীপ্র বলে বসল।

টং হং হেসে উঠল, কী বোকার মতো কথা বলছে দেখো! ভালোবাসা কি একটা শরীর নাকি শুধু? একটা অবয়ব মাত্র? ভালোবাসা তো একটা অনুভূতি। সারাজীবন দেখা না-হলেও সেটা যেমনকার তেমনই থাকবে। আমার বাবাকে তো আমি শেষ আটবছর দেখিনি। বাবার প্রতি আমার ভালোবাসা একটুও কমেছে নাকি?

—টং হং একদম ঠিক বলছে। না-দেখতে পেলে 'লাস্ট' কমে যেতে পারে কিন্তু 'লাভ' উইল অলসো গ্রো। মোবাথা বলল।

—আর সেটা কেন জানো? পৃথিবীতে যাই বেড়ে ওঠে তাই ম্যালিগন্যান্ট হয়ে যায়। ভিতরের টিউমারই হোক কিংবা বাইরের ক্ষমতা। একমাত্র ভালোবাসাই যত বাড়ুক ম্যালিগন্যান্ট হয় না কখনও। সেই 'আনম্যালিগন্যান্সি অফ লাভ' তুমি কখনও ফিল করোনি দীপ্র? টং হং জিজ্ঞেস করল।

প্রশ্নটা মাথায় নিয়েই ঘরে ফিরল বলে প্রশ্নটা রয়েই গেল। আর সেটা পাল্টা একটা প্রশ্নের জন্ম দিল দীপ্রর ভিতরে। বিশাখাবউদি কেন কাছে ডাকছে ওকে? ওই বা যাওয়ার জন্য এত উৎসাহিত কেন? কোথাও কোনও ভালোবাসা নেই তো তার মধ্যে। পুরোটাই তো শরীরী কামনা। আগুনে যা কাঠই দিতে পারে, জল দেয় না কখনও। তাহলে কেন তার পিছনে ছুটবে দীপ্র? ভাবতে ভাবতে ব্লেডের চাইতেও ধারালো বিশাখাবউদির পাশে হঠাৎ করেই ওই চোখ ছোট, নাক বোঁচা টং হঙকে অনেক বেশি প্রেমিকাসুলভ লাগল। তিয়েনআনমেনে নিজের পুরুষকে হারিয়ে যারা সারাজীবন হৃদয়ে ধূপকাঠি জ্বালিয়ে বেঁচে আছে, সেই মেয়েগুলোকে প্রণাম মনে হল। আচ্ছা ওই যে 'আনম্যালিগন্যান্সি অফ লাভ'এর কথা বলছিল টং হং, দীপ্র কি কোথাও কারও কাছে তার সন্ধান পাবে?

পাক আর না-পাক, বিশাখাবউদির কাছে তার খোঁজে যাওয়ার কোনও মানে হয় না। ওখানে ভালবাসা নেই শুধু... নিজেকে প্রাণপণ চেষ্টায় ওই 'শুধু'র বাইরে আনবে বলে বিশাখাবউদি আর শান্তনুদার নম্বর দুটো ব্লক করে দিল নিজের মোবাইলে। তারপর ওই কথাগুলি মেয়েটাকেই 'সরি' বলে একটা মেসেজ লিখল। ওই বিকিনি পরা সুন্দরীদের ভিড়ে দীপ্রর ছবি দেখে চটে গিয়েছে মেয়েটা। কিন্তু কেন গিয়েছে? মনের ভিতরে কিছু আছে দীপ্রর জন্য?

১৯

কার মনের ভিতরে কী আছে, না আছে তা হয়তো কখনও-সখনও জানা যায়। কিন্তু সময়ের ভিতরে কী আছে তা জানার সত্যিই কোনও উপায় নেই। তা নইলে সুচন্দ্রার সঙ্গে ওর যে এখন মাঝেমধ্যেই দিব্যি কথা হয় এবং আস্তে আস্তে ওরা পরস্পরের বন্ধু হয়ে উঠছে সেই খবর ফোনে দেয়ালিকে জানাতে জানাতে হোস্টেলে ঢুকে ও এরকম ভূত দেখার মতো চমকে উঠবে কেন? সাতমাস আগে শেষ দেখা তবু এই চেহারা আর ওই মুখ তো এইজীবনে ভোলার নয়। কিন্তু বার্ন লেকের সামনে বিকিনি পরা মহিলা এখন এরকম সাদা শাড়ি আর সাদা ব্লাউজ পরেছে কেন? বড়পিসি এরকম পরত ও ছোটবেলায় দেখেছে। কিন্তু সে তো বহুযুগ আগের ঘটনা।

—আমাকে দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছ, দীপ্র? বিশাখাবউদি ওর মুখোমুখি এসে দাঁড়াল।

—না, মানে এরকম ড্রেস...

—এখন তো সামার। অসুবিধে নেই। কিন্তু উইন্টার হলেও এই পোশাকেই আসতাম তোমার কাছে। তুমি ফোনে ব্লক করে দিয়েছ, সব যোগাযোগ ছিন্ন করে দিয়েছ, তবু খবরটা যে তোমাকে দিতেই হত দীপ্র।

—কী খবর বউদি?

—বিশাখাবউদি হাত বাড়িয়ে দীপ্রর হাতটা ধরে বলল, কী খবর তুমি বুঝতে পারছ না?

(চলবে)

boierpathshala.blogspot.com

পর্ব ১০

থাকে শুধু অন্ধকার

■ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি সত্যিই বুঝতে পারছি না বউদি।

—আর আমাকে বউদি বোলো না দীপ্র। তোমার শান্তনুদাই তো আর নেই।

—মানে? কী বলছ?

—যা তুমি শুনছো। মেয়েরা কখন এই পোশাক পরে তা তো তোমার অজানা নয় দীপ্র।

—আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। কিছুতেই না।

—বিশ্বাস না করে কী করবে বলো? যা ঘটেছে তা তো বিশ্বাস করতেই হবে।

—কিন্তু, কোথায়? কীভাবে? কবে?

—বিশাখাবউদি হেসে উঠল। আমি এভাবে তোমার সামনে এসে না দাঁড়ালে তোমার মনে কি এই প্রশ্নগুলো আসত? তুমি তো আমাকে ভুলেই গিয়েছিলে না ভুলে যেতে চাইছিলে।

—না, বউদি ব্যাপারটা সেরকম নয়। আসলে আমি বুঝতে পারছিলাম না ঠিক করছি না ভুল। কিন্তু সেই প্রসঙ্গ নিয়ে পরেও আলোচনা করা যাবে। তুমি বলো, শান্তনুদার কী হয়েছিল?

—গোয়ায় একটা নৌকা করে সমুদ্রে ভেসে পড়েছিল। ও আর এখানকার স্থানীয় দু'-তিনজন। প্রচণ্ড ঝড় উঠেছিল সেদিন রাতে। নৌকাটা উলটে যায় সমুদ্রে।

—কিন্তু শান্তনুদা তো সাঁতার জানত।

—উথালপাথাল সমুদ্রে সাঁতার জেনেও কিছু লাভ হয় না। আর তাছাড়া এমন হতেই পারে যে নৌকায় অন্য যারা ছিল তাদেরই কেউ শান্তনুকে ঠেলে দিয়েছিল জলে।

—কিন্তু কেন? তাতে ওদের কী লাভ?

—কলকাতায় বাড়িতে ঢুকে একা থাকা মানুষকে যারা খুন করে যায়, তাদের কী লাভ হয় দীপ্র?

—সে তো টাকার জন্য...

—এখানেও তাই। ওরা হয়তো এনআরআই শান্তনুকে অনেক টাকার মালিক ভেবেছিল। সেই টাকাটা হাতিয়ে নেওয়ার জন্যই...

—মাই গুডনেস। পুলিশ কী বলছে?

—ইন্ডিয়ায় পুলিশ টাকা খেলে তারপর তদন্তে

আমি বেঁচে আছি তাতে কার আনন্দ বলো তো? কার? শান্তনুর মা বলছে যে, আমি ডাইনি। ওঁর ছেলেকে খেয়েছি। ওর আত্মীয়-স্বজনরাও তাই বলছে। আমি ইন্ডিয়ায় যখন গিয়েছিলাম তখন কী দুর্ব্যবহার ওরা আমার সঙ্গে করেছে তুমি কল্পনা করতে পারবে না দীপ্র। কিন্তু আমাকে তো যেতেই হত, তাই না? শান্তনুর মৃতদেহ নিজের চোখে না-দেখে আমি ঘটনাটা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।

ছোটে। কিন্তু, পুলিশকে টাকা দেবে কে? শান্তনু তো টাকা নিয়ে দেশে যায়নি, টাকার খোঁজেই গিয়েছিল ইনফ্যাক্ট।

—বুঝলাম না।

—তুমি কি এই রিসেপশনে দাঁড়িয়েই সবটা বুঝে ফেলবে? আমার যে পা ব্যথা করছে।

দীপ্র অস্বস্তিতে পড়লেও, বিশাখাবউদিকে নিজের ঘরে নিয়ে গেল না। রিসেপশন লাগোয়া কফিশপটায় বসাল।

—তোমার সঙ্গে যখন আলাপ সেই সময় থেকেই শান্তনুর চাকরি ছিল না। তুমি বুঝতে পারনি কারণ আমি বুঝতে দেইনি। কিন্তু শেষদিকে আমিও আর পারছিলাম না।

—শান্তনুদা তো বড় চাকরি করত?

—তোমার বেশ কিছুদিন হয়ে গেল স্টেটসে। তুমি জানো না যে, আমেরিকায় বড় চাকরি, ছোট চাকরি বলে কিছু হয় না? এখানে বাজারের চাহিদা অনুযায়ী চাকরি তৈরি হয় আবার চলেও যায়। শান্তনু তো পেট্রোলিয়াম কোম্পানিতে চাকরি করত আর তাদের অস্তিত্বই এখন সংকটের মুখে।

—পেট্রোলিয়াম কোম্পানিতে ট্রাবল? যা ছাড়া একঘণ্টা চলবে না, এক মিনিটও হয়তো নয়, সেই কোম্পানিতে সমস্যা?

—প্রশ্নটা ঠিকই করেছ। কিন্তু উত্তরটা হচ্ছে, পেট্রোলিয়াম ছাড়া 'চলবে না' কথাটা ভুল, 'চলত না' কথাটা বরং ঠিক। যত দিন যাচ্ছে, আমেরিকায় ব্যাটারি চালিত গাড়ির সংখ্যা বাড়ছে। আর দশ বছর পরে পেট্রোলের ব্যবহার খুবই সীমিত হয়ে যাবে। পেট্রোলের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে বললেও অত্যুক্তি হবে না। তখন এই কোম্পানিগুলো টিকবে কী করে?

—কিন্তু সে তো পরের কথা...

—পরের কথা আগে থেকে ভাবতে শুরু করে বলেই দেশটা আমেরিকা। আর এখানে থাকতে গেলে আমাদেরও তাই করতে হবে। আমি তা করিনি বলেই আজ এত খাটে পড়েছি। নিজের গাড়ির পেট্রোল কাল ভরাতে পারব কি না জানি না। শান্তনু আমাকে ওর সঙ্গে যেতে বলেছিল। যদি যেতাম তো সত্যিই ভালো হত। ওর সঙ্গে আমিও স্বর্গের পথে হাঁটা লাগাতাম। থামা ধরে এল বিশাখা বউদির।

—না, বউদি এরকম বলবে না। শান্তনুদা চলে গিয়েছে সেটা মেনে নিতে পারছি না এখনও। কিন্তু তুমি যে বেঁচে আছ সেটার আনন্দ কম হয় না তাতে।

— আমি বেঁচে আছি তাতে কার আনন্দ বলো তো? কার? শান্তনুর মা বলছে যে, আমি ডাইনি। ওঁর ছেলেকে খেয়েছি। ওর আত্মীয়-স্বজনরাও তাই বলছে। আমি ইন্ডিয়ায় যখন গিয়েছিলাম তখন কী দুর্ব্যবহার ওরা আমার সঙ্গে করেছে তুমি কল্পনা করতে পারবে না দীপ্র। কিন্তু আমাকে তো যেতেই হত, তাই না? শান্তনুর মৃতদেহ নিজের চোখে না-দেখে আমি ঘটনাটা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।

—দেখতে পেয়েছিলে?

—যা দেখেছিলাম তাকে আর শান্তনু বলে চেনা যায় না। তবু পারিপার্শ্বিক প্রমাণ, জামা-প্যান্ট ইত্যাদি সব মিলিয়ে সেটাই শান্তনু।

—কিন্তু নাও তো হতে পারে? কে জানে, হয়তো শান্তনুদা এখনও...

—না দীপ্র। শান্তনুর হাঁটুর কাছে একটা জন্ম-জড়ুল ছিল। ইনফ্যাক্ট সেটা দেখেই আমি চিহ্নিত করি ওকে। আর করলেই তো হল না। শান্তনু যে সত্যিই মারা গিয়েছে সেই প্রমাণ তো আমাকে ইনস্যুরেন্স কোম্পানির কাছে দাখিল করতে হবে। নয়তো ওরাই বা টাকা দেবে কেন?

—সিয়েছে টাকা?

—এত সহজ তো নয় দীপ্র। আবার আমেরিকা বলেই অতটা কঠিনও নয়। ইনস্যুরেন্সের যে অফিসার শান্তনুর কেসটা হ্যান্ডল করছেন তিনি খুবই কনসিডারেট। যদিও ইন্ডিয়া থেকে শান্তনুর দু'-একজন আত্মীয় কাঠি করার চেষ্টা করছে তবু উনি যেরকম দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছেন তাতে আগামী এক-দু'মাসের মধ্যেই আমার ক্লেইম সেটল হয়ে যাবে আশা করি।

—যাক। একটু নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

—তুমি পুরোটাই নিশ্চিন্ত। আমি না-খেয়ে মরলেও তোমার কাছে টাকা চাইব না। আজও যে এসেছি সেটা অন্য একটা চাওয়া নিয়ে।

—আমাকে এতটা ভুল ভাবো বউদি?

—ভাবতে তুমিই বাধ্য করেছ দীপ্র। যাদের আমেরিকায় নিজের একমাত্র আত্মীয় বলে মনে করতে তাদের থেকে নিজেকে একেবারে ছিন্ন করে

boierpathshala.blogspot.com

নিয়ে কোন মেসেজ দিচ্ছিলে তুমি আমাকে?

—আমি নিজেকে ডিফেন্ড করতে পারব না। আর সেই চেষ্টাও করছি না। বাট আমি সবসময় চেয়েছি যে...

—তোমার চাওয়ার কথা পরে শুনব। আগে শোনো, আমি কী চাইতে এসেছি। প্লিজ মুখের ওপর 'না' বলে দিও না।

—বলব না। তুমি বলো।

—তুমি তো দেখেছ, শান্তনু আর আমার কী অসম্ভব ভালো আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল। আমি যা খুশি তাই বলতে পারতাম ওর সামনে। যাকে খুশি জড়িয়ে ধরতে পারতাম। ওরও একই স্বাধীনতা ছিল। আসলে আমরা জানতাম একে-অপরকে কতটা ভালোবাসি। তাই কিছু দেখানোর দরকার ছিল না। মাটির তলার নদীর মতো সেই ভালোবাসা প্রবাহিত হত আমাদের ভিতরে।

দীপ্র ভাবছিল মাটির তলা দিয়ে নদী বয়ে গেলেও কি মাটির ওপরে একটা নদী লাগে? তা না হলে পর শান্তনুদা যখন বাইরে থাকবে তখন ওকে নিজের কাছে চাইছিল কেন বিশাখাবউদি? কিন্তু, জিন্স আর টপ পরা মহিলাকে যে প্রশ্নগুলো করা যায়, সাদা শাড়ির বিধবাকে সেই প্রশ্নগুলো করা খুব অশালীন।

কফিতে শেষ চুমুক দিয়ে বিশাখাবউদি বলল, সামনের সপ্তাহে শনিবার শান্তনুর জন্মদিন। প্রতিবার এই দিনটা আমি আর শান্তনু একসঙ্গে সেলিব্রেট করতাম। এবার ও নেই বলেই দিনটাকে ভুলে যাব, তা তো হয় না দীপ্র। আমি চাই, খুব করে চাই, তুমি আসছে শুক্রবার রাতে ডি-ম্যানে চলে এসো। ভয় নেই, আমি তোমায় এমন কিছু বলব না যাতে তুমি বিব্রত বোধ করো। সেই সময়, সেই মন কোনওটাই নেই। কিন্তু স্মৃতি তো আছে দীপ্র। সেই স্মৃতির সম্মানে তুমি আর একটিবার আমাদের বাড়িতে আসবে না? আমি আরও দু'-একজনকে বলেছি। কিন্তু তুমি না-এলে তোমার শান্তনুদার আত্মা শান্তি পাবে না। তোমায় কতটা ভালোবাসত তা তো আমি জানি।

দীপ্রর একবার মনে হল জিজ্ঞেস করে যে শান্তনুদা কী জানত যে, দীপ্রর কতটা দুর্বলতা ছিল ওর বউয়ের উপর। সেটা জানলেও এটা নিশ্চয়ই জানত না যে ওর বউও প্রশ্রয় দিয়েছিল সেই দুর্বলতাকে। কিন্তু আবার চুপ করেই গেল কিছু না বলে। ইচ্ছেটা যখন বাস্তবে রূপ নেয়নি তখন সেই প্রসঙ্গ তুলে একজন বিধবাকে অপমান করার কোনও অর্থ হয় না। প্রজাপতিকে গুঁয়োপোকা বলে ডাকার মতোই বিশাখাবউদিকে আগের প্রসঙ্গ টেনে এনে কিছু বলাটা উচিত নয় এখন।

শুক্রবার রাতে নয় শনিবার দুপুরেই ডি-ম্যানে গেল দীপ্র, মোবাথার গাড়িটা ধার নিয়ে। এতদিনেও ও গাড়ি চালাতে শিখে গিয়েছে। কিন্তু গাড়ি কেনার মতো পয়সা তো আর নেই তাই অন্যের গাড়িই সম্বল। মোবাথা বা লি অবশ্য এসব ব্যাপারে ভীষণই দরাজ। এমন কখনোই হয়নি যে দীপ্র গাড়ি চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। অবশ্য দীপ্র খুব কমই চেয়েছে, সেটাও বলতে হবে। পেলেই যে নিতে নেই সেই বোধটা ভিতরে জাগরূক থাকার অনেক সুবিধে। এটা ও ছেলেবেলায় না হলেও কৈশোরে শিখেছিল। আর সাধ্যমতো মেনে চলার চেষ্টা আজি তেখেছে।

ফুল নিয়ে গিয়ে শান্তনুদার ছবির সামনে গিয়ে দেখল, গোটা ঘরে ও আর বিশাখাবউদি ছাড়া আর দু'জন মাত্র লোক। একজন বৃদ্ধা মেম এবং আর একজন ততোধিক বৃদ্ধ বাঙালি ভদ্রলোক। দ্বিতীয়জন যখন কাঁপা কাঁপা গলায়, 'থাকে শুধু অন্ধকার মুখোমুখি বসিবার...' আবৃত্তি করছেন দীপ্রর মুহূর্তের জন্য সুকন্যার কথা মনে পড়ে গেল। ইউনিভার্সিটির সেই অন্ধকারে এই কবিতাটাই আবৃত্তি হচ্ছিল না? সেদিন কে যেন কার কোলে মাথা দিয়ে শুয়েছিল? মাথা থেকে ভাবনাটা দূর করার জন্য আজ সকালে ড্রাইভ করার সময় আসা সুচন্দ্রার ফোনটার কথা ভাবতে চাইছিল দীপ্র। কেন, সুচন্দ্রার হোয়াটস অ্যাপ কলে কথা বলতে বলতে ও জানাতে পারল না, এগজ্যাক্টলি কোথায় যাচ্ছে? কেন মিথ্যার আশ্রয়

নিতে হল? একটা শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানে যাচ্ছে বলতে হল? আসলে সত্যিগুলো একেকসময় এত ভুল বোঝাবুঝির জন্ম দেয় যে মিথ্যা না-বললেও সেগুলো চেপে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।

—এত কম লোক কেন, সে প্রশ্ন নিশ্চয়ই জাগছে তোমার মাথায়? বিশাখাবউদি বলল।

—তুমি নিশ্চয়ই বেশি লোক চাইছিলে না বলে নেমন্তন্ন করোনি।

—সেটা একরকম ঠিক আবার নেমন্তন্ন করলেই যে আসত তাও তো নয়। বাঙালিরা বাঙালিদের দেখতে পারে না জানো তো। তাই এখানে যদি বেশি বাঙালি থাকত তাহলে তুমি কে, কোত্থেকে এসেছ, তাই নিয়ে রিসার্চ শুরু করত। আর মনমতো উত্তর না পেলে বাইরে গিয়ে কুৎসা করত। এই ডি-ম্যানে যে বাঙালি প্রায় নেই-ই, সেটা একরকম বাঁচোয়া দীপ্র। থাকলে আমি তোমায় রাতে খেতে যেতে বলতে পারতাম না, হোটেলে গিয়ে থাকত হত আমায়। বিশাখাবউদি ম্লান হাসল।

—আমি তো সন্ধেবেলা ফিরে যাব ঠিক করে এসেছি।

—তুমি ভয়েদার আপডেট দেখনি? গোটা আইওয়া জুড়ে একটা ভয়ংকর ব্লিজার্ড আসছে তার সতর্কতা জারি করা হয়েছে। তাই তো প্রোগ্রামটা এগিয়ে দিলাম। কিন্তু এখন এর মধ্যে তোমায় কীভাবে ছাড়ি আমি বলো তো?

—কিচ্ছু প্রবলেম হবে না বউদি। আমি আরামসে পৌঁছে যাব।

বিশাখাবউদি ডুকরে কেঁদে উঠল। শান্তনুও বলেছিল যে ও আরামসে ফিরে আসবে। কিন্তু ফিরল না তো কই?

দীপ্র স্বাভাবিক সৌজন্যেই এগিয়ে গিয়ে বিশাখাবউদির মাথায় একটা হাত রাখল।

বিশাখাবউদির কান্না বেড়ে গেল। আমি শান্তনুকে যেতে দিয়ে নিজের সর্বনাশ করেছি দীপ্র। তোমাকে আজ যেতে দিতে পারব না তাই কিছুতেই। আমার সঙ্গে এক বাড়িতে থাকতে অসুবিধে হলে তুমি বল আমি ওই যে ক্যাথলিন এসেছিল তার বাড়িতে চলে যাচ্ছি। বাট ইউ মাস্ট স্টে হিয়ার।

—তুমি থাকলেও আমার এই বাড়িতে থাকতে কোনও অসুবিধে নেই। আগেও তো থেকেছি। দীপ্র বলল। বিশাখাবউদির রান্না করা চমৎকার স্যামন মাছ খেতে খেতে।

—তুমি ভালোবাসো বলে স্যামন আনলাম। শান্তনুও খুব ভালোবাসত এই প্রিপারেশনটা। কিন্তু এখন আর রান্না করে খাওয়ানোর কেউ নেই বলে রান্না করি না। নিজেও না খেয়েই থাকি অর্ধেক দিন। ভাললাগে না আস্ট। কী করব?

—না বউদি। তোমাকে খেতে হবে, বাঁচতে হবে। এভাবে চলতে থাকলে, তুমি পাগল হয়ে যাবে।

বিশাখাবউদি একটা গ্লাসে করে ওয়াইন এগিয়ে দিল দীপ্রর দিকে।

ওয়াইন খেতে দীপ্র ভালোবাসে। কিন্তু ওয়াইনটা ভিতরে যাওয়ার পরপরই কেমন একটা তোলপাড় শুরু হল ভিতরে।

—দাঁড়াও একটু রুম ফ্রেশনার দিয়ে দিই। কীরকম যেন স্টাফি লাগছে ঘরটা। বলেই বিশাখাবউদি একটা কী যেন স্প্রে করল দীপ্রর চারপাশের বাতাসে। বাতাসটা কেমন মোহময় হয়ে উঠল।

—আমি পাগল হয়ে যেতে চাই না দীপ্র। আমি বাঁচতে চাই, কাজ করতে চাই। জীবনটাকে নষ্ট করতে চাই না। বলতে বলতে বিশাখাবউদি আবার ভর্তি করে দিল দীপ্রর গ্লাস।

দীপ্রর মনে হচ্ছিল, ওই ওয়াইনে চুমুক দিতে দিতে জীবনের কষ্টগুলোকে, আঘাতগুলোকে, মৃত্যুগুলোকে পেরিয়ে আসতে পারে মানুষ। বিশাখাবউদিও পারবে। ঘরে চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়ের গলায় বাজছিল রবীন্দ্রসংগীত, 'মনে কি দ্বিধা রেখে গেলে চলে'...একটা দ্বিধার দু'দিকে ওরা দু'জন বসে ছিল যেন। আর একটা মদের ঝরনা আস্তে আস্তে দ্বিধাটাকে ভেঙে দিচ্ছিল। দীপ্রর পায়ের নীচের কার্পেটটা মাটির মতো ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছিল। চারপাশের হাওয়াটা কি ফায়ারপ্লেসের তাপে গরম হয়ে উঠছিল?

বিশাখা বউদি গল্প বলছিল। শান্তনুদার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের গল্প, ওদের হানিমুনে যাওয়ার গল্প আরও কত গল্প। বলতে বলতে কানের হিরেটা দেখিয়ে, 'এটা আগেরবার বিবাহবার্ষিকীতে শান্তনু দিয়েছিল' বলতে বলতে বিশাখাবউদি কেঁদে উঠল। আর প্রাণপণ চেষ্টায় কান্নাটা চেপে জিজ্ঞেস করল, আমার জীবনটা কি একদম শেষ হয়ে গেল দীপ্র? আমার জীবনে আর কোনওদিন হাসি আসবে না, গান আসবে না, প্রেম আসবে না, হানিমুন আসবে না, সন্তান আসবে না, আরও যতদিন বাঁচব একটা মধ্যবুড়ির মতো, একা একা কাটাতে হবে?

—না, তুমি ঘর্মী নও। তুমি পৃথিবীর সবথেকে সুন্দরী একটা মেয়ে। সুন্দর একটা মানুষ। দীপ্র বলে উঠল। ওর মনে হল আচমকা ঘরের তাপমাত্রাটা অনেকখানি বেড়ে গিয়েছে।

—তুমি কীভাবে এই কথাটা বলছ দীপ্র? তোমার তো এই কথাটা বলার মতো সাহস নেই...থাকলে পরে সাত মাস...

—পুরনো কথা বাদ দাও বউদি। যা হয়ে গিয়েছে, তা গিয়েছে। দীপ্র থামিয়ে দিল ওকে।

—আমি তো বাদ দিতেই চাই। কিন্তু তোমার কি নতুন কথা শুরু করার সাহস আছে? যাকে প্রাণ দিয়ে চাও তার প্রাণ বাঁচানোর ক্ষমতা আছে? বলো দীপ্র বলো।

—কী বলব?

—তুমি পুরুষ না কাপুরুষ সেইটুকু বলবে! বলো।

—আমি কাপুরুষ নই।

বাইরে বিদ্যুৎ চমকাল। বাজের শব্দ হল। বৃষ্টিও নামল সম্ভবত। কিন্তু ঘরের গরমটা এতটা বেড়ে গেল কেন? কীভাবে?

বিশাখাবউদি দীপ্রকে জড়িয়ে ধরে ওর গালে গাল ঘষতে ঘষতে বলল, কেন সাহস পাচ্ছ না? আমাকে ভালোবাসো না? আমায় মিস করো না? তোমার চোখে যে আমি অন্য কিছু দেখি। মুখে সেই কথাটা বলো না কেন?

দীপ্র নেশার ঘোরেই হয়তো জীবনে প্রথমবার কবিতার তিনটে শব্দ উচ্চারণ করল, 'থাকে শুধু অন্ধকার'...বিশাখাবউদি গাল ছেড়ে ওর ঠোঁটে নিজের ঠোঁট নিয়ে এসে বলল, কোনও অন্ধকার থাকবে না যখন আমরা মুখোমুখি বসব। বলো না দীপ্র, থাকবে আমার সঙ্গে? বিয়ে করবে আমাকে?

—জানি না, আমি কিছু জানি না। আমার রিসার্চ ইনকমপ্লিট।

—আমার তো গ্রিনকার্ড আছে। সিটিজেনশিপ হয়ে যাবে একবছরের মধ্যেই। আমার বর হিসেবে তুমি আপসে ইউএস সিটিজেন হয়ে যাবে। তোমার সমস্ত দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যাবে।

—তাই? কিন্তু ঘরটা এত গরম হয়ে উঠল কেন?

—ভালোবাসায় গরম হয়ে উঠছে ঘর। তুমি বুঝছ না দীপ্র? ঘরটাও চাইছে তোমার আমার একটা নতুন জীবন শুরু হোক। নেবে? আমাকে তোমার স্ত্রী করে নেবে? দেবে একটা নতুন পরিচয় আমাকে?

—তাহলেই ব্লিজার্ড থেমে যাবে? দীপ্র নিজেকে সোফা থেকে খাটে আবিষ্কার করল।

ফোনটা কেঁপে উঠল। দীপ্র হাত বাড়াল। কিন্তু ওর হাত ফোনটা ছোঁয়ার আগেই ও দেখল বিশাখাবউদি ইংরেজিতে কাকে কী বলছে। কথাগুলো কেমন আমেরিকানদের মতো করে বলছিল বিশাখাবউদি। কিচ্ছু বুঝতে পারছিল না দীপ্র। ঘাম হচ্ছিল ওর। আর কেমন একটা পাহাড় ভিতর ঠেলে বাইরে আসতে চাইছিল। দীপ্র ঠেকাতে পারছিল না।

—কার ফোন ছিল বউদি?

—একদম বউদি বলবে না আর এই মুহূর্ত থেকে। আমি বিশাখা, শুধুই বিশাখা, তোমার বিশাখা। তুমি চাইলে অবশ্য 'সোনা' বলতে পারো আমাকে। বলবে সোনা?

বিশাখাকে নিজের বুকের উপর দেখে দুটো হাত বাড়াল দীপ্র ওকে জড়িয়ে ধরতে। আর তখনও জিজ্ঞেস করল, কে ফোন করেছিল?

—একটা ব্লিজার্ড ফোন করেছিল। আমি ওকে বলে দিয়েছি এই ঘরের বাইরে থাকতে এখন। ভিতরে ঢুকে আমাদের ডিসটার্ব না করতে। খিলখিলিয়ে হেসে উঠল বিশাখা।

—সেই হাসির সামনে বাস্তিল দুর্গ পড়ে যাবে তো দীপ্র কোন ছাড়। তবু তলিয়ে যাওয়ার আগের মুহূর্তে দীপ্র ভাবল, ব্লিজার্ডটা কে? কেন ফোন করেছিল? (চলবে)

boierpathshala.blogspot.com

পর্ব ১১

থাকে শুধু অন্ধকার

■ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

২০

মেয়েটাকে ঘরে ডেকে নিয়ে এসে ওর চোখের দিকে তাকাতেই কি একটা যেন ঘটে গেল। আকাশের সবটুকু ঢেকে দিল মেঘ আর আমি নরম দুটো পায়রাকে নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে আদরে আদরে...। মেয়েটাও একটা জলপ্রপাতের মতো আছড়ে পড়তে লাগল আমার সর্বাঙ্গে। এমন একটা স্নানে ও আমায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল যার প্রতিটি ফোঁটায় ধুয়ে যায় সমস্ত না-পাওয়া। নিশিজাকের মতো দুটো শরীর পরস্পরকে ডাকতে থাকল আর সেই ডাকে সাড়া দিয়ে উঠল দুটো শরীরই। ভাব আর আড়ি, জল আর নৌকা একে অন্যের মধ্যে মিশে যেতে থাকল।'

বইটা ছুড়ে মেঝেতে ফেলে দিল সুচন্দ্রা। অসহ্য, অসভ্য। এইসব এখনকার লেখা? এই উপন্যাস? এই গল্প? মন নেই, প্রেম নেই, শুধু শরীর আর শরীর। সুচন্দ্রার পাগল পাগল লাগছিল। তবে তার পিছনে বড় কারণ অবশ্য এই বইটা নয়। সেখানে কে কী লিখেছে বয়েই গিয়েছে। পাগল পাগল লাগার কারণ দীপ্রর ফোনে সাহেবি অ্যাকসেন্টে এক মহিলার বলে ওঠা, 'ব্লিজার্ড ইজ অন ইটস ওয়ে। প্লিজ ডু নট ডিস্টার্ব আস।'

কীসের ব্লিজার্ড? কেন ব্লিজার্ড? ডিকশনারি খুলে তিনবার 'ব্লিজার্ড' শব্দের মানে দেখল সুচন্দ্রা। দীপ্র কি কোনও ঝড়ে আটকে পড়েছে? আমেরিকার কোথায় এমন কোনও ঝড়ে গিয়ে পড়ল যেখান থেকে ও ফোন ধরতে পারছে না? সেই ঝড়ে কি ওর কোনও বিপদ হয়েছে? তা না হলে ওর ফোন কোনও মেমসাহেব কেন ধরলেন? নাকি ওই মেমসাহেবের গলাটা কোন রেকর্ডেড ভয়েস যাতা যান্ত্রিক খবর দেয় শুধু? কীরকম একটা অশান্তি হচ্ছিল সুচন্দ্রার। ওর বারবার মনে হচ্ছিল দীপ্রর বাড়িতে ফোন করে ওর মায়ের সঙ্গে কথা বলে। কিন্তু আবার ভাবছিল ওর মাকে টেনশন দেওয়া উচিত হবে, না হবে না? নিজের মনের মধ্যে যে টানাপোড়েন চলছিল কিছুতেই তার থেকে বেরতে পারছিল না সুচন্দ্রা। ডিভিডিতে একটা নতুন সিনেমা চালিয়ে বেশ কিছুক্ষণ বসে রইল, কিন্তু মন লাগাতে পারল না একটুও। মা খেতে ডাকল যখন তখন 'হ্যাঁ-হুঁ' বলে গেল ক্রমাগত। মা একটা সময়ের পর বলল, তোর সঙ্গে হো এখন কথা-টথা হয় দীপ্রর, তাই না?

—হ্যাঁ হয়, কিন্তু এখন হচ্ছে না। বলে সুচন্দ্রা উঠে গেল টেবিল থেকে।

বইটা ছুড়ে মেঝেতে ফেলে দিল সুচন্দ্রা। অসহ্য, অসভ্য। এইসব এখনকার লেখা? এই উপন্যাস? এই গল্প? মন নেই, প্রেম নেই, শুধু শরীর আর শরীর। সুচন্দ্রার পাগল পাগল লাগছিল। তবে তার পিছনে বড় কারণ অবশ্য এই বইটা নয়। সেখানে কে কী লিখেছে বয়েই গিয়েছে। পাগল পাগল লাগার কারণ দীপ্রর ফোনে সাহেবি অ্যাকসেন্টে এক মহিলার বলে ওঠা, 'ব্লিজার্ড ইজ অন ইটস ওয়ে। প্লিজ ডু নট ডিস্টার্ব আস।' কীসের ব্লিজার্ড? কেন ব্লিজার্ড? ডিকশনারি খুলে তিনবার 'ব্লিজার্ড' শব্দের মানে দেখল সুচন্দ্রা। দীপ্র কি কোনও ঝড়ে আটকে পড়েছে? আমেরিকার কোথায় এমন কোনও ঝড়ে গিয়ে পড়ল যেখান থেকে ও ফোন ধরতে পারছে না? সেই ঝড়ে কি ওর কোনও বিপদ হয়েছে? তা না হলে ওর ফোন কোনও মেমসাহেব কেন ধরলেন?

ছেলেটার সঙ্গে যখন পরিচয় ছিল না তখন একরকম। কিন্তু বিগত ছ'মাস নানা বিষয়ে কথা বলতে বলতে কোথায় একটা সংযোগ তৈরি হয়ে গিয়েছে। এই সময়ের আর পাঁচটা ছেলের থেকে একটু আলাদা দীপ্র। ওর বন্ধুদের কাছ থেকে ও শুনেছে যে তাদের বয়ফ্রেন্ডরা পরিচয়ের মাসখানেকের মধ্যেই স্কাইপে কিংবা মোবাইলে নানারকম ছবির আবদার করেছে। যে ছবিতে শুধু শরীর থাকে, কোনও জামাকাপড় থাকে না। কিন্তু, এতদিন ধরে কথা বললেও দীপ্র কোনওদিন সীমা লঙ্ঘন করেনি। দু'-এক সময় সুচন্দ্রারই মনে হয়েছে ও আরেকটু বেশি বলতে পারে। আরও এক-দু' ধাপ এগিয়ে যেতে পারে। কিন্তু, না। ঠিক কোথায় থামতে হবে সেটা যেন আগের থেকে দীপ্রর ভেতরে প্রোগ্রাম করা আছে।

মা একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। সুচন্দ্রার ভিতরে যে ব্লিজার্ড চলছে তা জানা তো মায়ের পক্ষে সম্ভব নয়! ঘরে ফিরে এসে নিজের ফোনটা ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎ একটা ফোন নম্বরে চোখ আটকে গেল সুচন্দ্রার। এই তো সেই ফোন নম্বর। যেটা থেকে দীপ্র একদিন ওকে ফোন করেছিল ওর নিজের ফোনটার চার্জ চলে গিয়েছিল বলে। এখানে ফোন করলে ও নিশ্চয়ই জানতে পারবে দীপ্র এখন কোথায় আছে? কেমন আছে? কোনও বিপদ হয়েছে কি না!

ছেলেটার সঙ্গে যখন পরিচয় ছিল না তখন একরকম। কিন্তু বিগত ছ'মাস নানা বিষয়ে কথা বলতে বলতে কোথায় একটা সংযোগ তৈরি হয়ে গিয়েছে। এই সময়ের আর পাঁচটা ছেলের থেকে একটু আলাদা দীপ্র। ওর বন্ধুদের কাছ থেকে ও শুনেছে যে তাদের বয়ফ্রেন্ডরা পরিচয়ের মাসখানেকের মধ্যেই স্কাইপে কিংবা মোবাইলে নানারকম ছবির আবদার করেছে। যে ছবিতে শুধু শরীর থাকে, কোনও জামাকাপড় থাকে না। কিন্তু, এতদিন ধরে কথা বললেও দীপ্র কোনওদিন সীমা লঙ্ঘন করেনি। দু'-এক সময় সুচন্দ্রারই মনে হয়েছে ও আরেকটু বেশি বলতে পারে। আরও এক-দু' ধাপ এগিয়ে যেতে পারে। কিন্তু, না। ঠিক কোথায় থামতে হবে সেটা যেন আগের থেকে দীপ্রর ভেতরে প্রোগ্রাম করা আছে। এত ভদ্র, এত সুসংযত। দীপ্রর মধ্যে কোনওদিন ব্যালেন্সের অভাব দেখেনি সে। সেই একবার শুধু লেকের ধারে নিজের একটা ছবি দিয়েছিল। যেটাতে ওর আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে বিকিনি পরা কয়েকটা মেয়ে। সেই ছবি নিয়ে সুচন্দ্রা নিজেকেই পরে বুঝিয়েছে 'যস্মিন দেশে যদাচার'। আমেরিকাতে গিয়ে তো আর শাড়ি পরা মেয়েদের মাঝে ঘুরতে পারে না দীপ্র?

সে সব যাক; এখন দীপ্র ভাল আছে কি না, সেটাই জানা দরকার। সুচন্দ্রা সাধারণত ফোন করে না নিজের থেকে। দীপ্রই করে। কিন্তু কীরকম একটা মন ডাকল...আচ্ছা মন কি খারাপ কিছু হলেই ডাকে? আমেরিকায় ক'টা বাজল সেটা ঠিক হিসেব করে উঠতে পারল না সুচন্দ্রা। ভাবনাটা বাতিল করে ভাবল, ঘটাই বাজুক, এখনই এই নম্বরে ফোন করে দীপ্রর খোঁজ নেওয়া দরকার। খোঁজ ওকে নিতেই হবে। ঝড় আসুক। ঝড়ের চলে যাওয়ার খবরটাও তো জানা দরকার।

আইওয়া সিটি নেহাতই ছোট। হাজার ষাট-সত্তর লোক থাকে। গ্লোরিফাইড গঞ্জ বললেও ভুল হয় না। কিন্তু, আধুনিক জীবনের সমস্ত সুবিধে আর জিমহ্যাম রাস্তা আমেরিকার সব ছোট শহরের মতো এখানেও আছে। আইওয়া বলে আমেরিকার মিডিওয়েস্টের

boierpathshala.blogspot.com

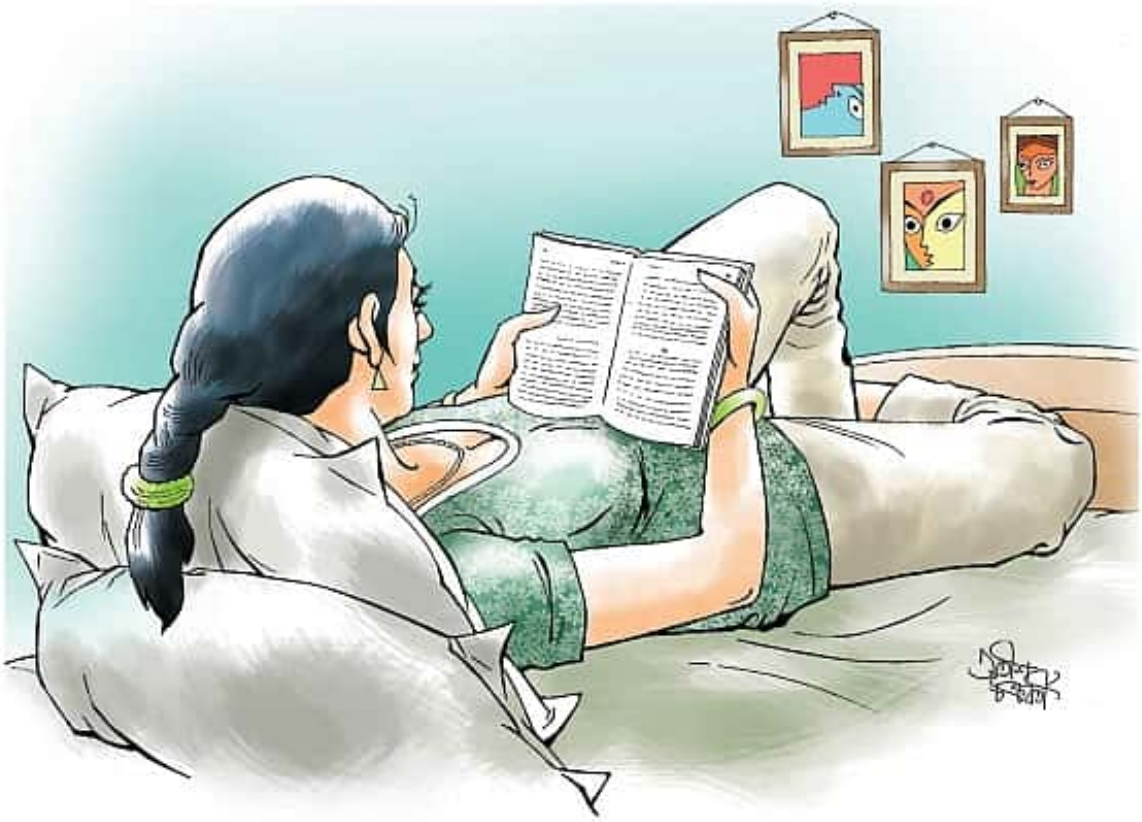

যে রাজ্য তারই রাজধানী ছিল শহরটা। ১৮৩৯ থেকে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। ওই বছরে আইওয়ার রাজধানী ডি-ময়েনে স্থানান্তরিত হয়ে যায়। এখনও সেখানেই আছে।

একটা কোন হলিউডি সিনেমায় নায়ক জিজ্ঞেস করে 'ইস দিস হেভেন!'

উত্তরে শোনে, 'নো ইটস আইওয়া।'

সেই ডায়ালগ নিয়ে আইওয়ার অনেকেরই প্রচ্ছন্ন গর্ব থাকলেও, আইওয়ার দীর্ঘদিনের খ্যাতি আমেরিকার 'কর্ন ক্যাপিটাল' হিসেবে। আদর করে এই রাজ্যটিকে 'মেসোপটেমিয়া' বলা হয়। কারণ, দু'দিক থেকে আমেরিকার প্রধান দুই নদী একে আগলে রেখেছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণ হয়ে গিয়েছে আইওয়ার চাইতে ফলনবিলাসী মাটি গোটা আমেরিকায় আর নেই। খুবই স্বাভাবিক যে ভুট্টা উৎপাদনে আইওয়া-ই এক নম্বরে। ভালিনের পর সিংহাসনে বসেই নিকিতা ক্রুশ্চেভ আইওয়াতে উড়ে গিয়েছিলেন ওই বিপুল খাদ্য ভাণ্ডারের হাল হকিকত জানবেন বলে।

নিজের তৈরি করা নোটে এই বিষয়গুলো লিখে টংহং একটু দেখছিল। বেশি সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছে কি? হোক। মানুষকে তো জানাতেও হবে।

আইওয়া শহরের গাইড হিসেবে ও ছুটির দিনগুলোয় কাজ করে। আর আইওয়ার রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে নিজের জেলবন্দি বাবার কথা খুব মনে পড়ে ওর। ইস! বাবাকে যদি শহরটা দেখাতে পারত! এই রোদের মধ্যে, ঝকঝকে রাস্তার মধ্যে, এই রং বদলাতে থাকা গাছগুলোর মধ্যে, আমেরিকার নয়নাভিরাম 'ফল'-এর মধ্যে বাবার সঙ্গে ও যদি ঘুরে বেড়াতে পারত! মন খারাপ হয়ে যায় টংহং-এর। কিন্তু, কাজটা কাজই। আইওয়া শহর যে ট্যুরিস্টদের ও ঘুরিয়ে দেখাবে তাদের যাতে কোথাও কোনওরকম কোনও আফশোস না-থাকে সেটা দেখে নেওয়া ওর কর্তব্য। আজকের গ্রুপটার সঙ্গে টংহং যখন বেরিয়েছে তখন কিছুটা মেঘ এসে আকাশে জমেছে। টংহং সেই মেঘের দিকে একবার তাকিয়ে ভাবছিল কোথা থেকে উড়ে আসে এই মেঘ? সেই সুদূর এশিয়া থেকে, চিনের সেই শহরটা থেকে যেখানে ওর বাবা চার দেওয়ালের ভেতর বন্দী আছে? যেখানে আছে ওর অনেক আত্মীয়। যারা মনে মনে অনেক কিছু ভাবে হয়তো, কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারে না। টংহং গ্রুপটার সামনে গিয়ে এক মুহূর্তের জন্য নিজেকে সংযত করে নিল তারপর বলল, আপনারা সবাই আজ এই শহরটা ঘুরে দেখবেন প্রথমবার। এর চড়াই-উতরাই রাস্তা আর গাছগাছালি, ক্যাপিটাল বিল্ডিং, গুল্ড ক্যাপিটাল মল, শার্টল বাস সার্ভিস, ব্লু রুট আর রেড রুট দুটোই কীভাবে গোটা ক্যাম্পাস জুড়ে ক্লক ওয়াইস চক্কর কাটছে, সব। তার সঙ্গে আপনারা চিনবেন এখানকার দুর্দান্ত সব রেস্তোরাঁ আর পাব। পিটাপিট, ওয়েসিস ফালাফাল, ব্যান্ডচোস, ব্রিকস ওয়াইন অ্যান্ড চিজ, মামাস ডেইলি, ইন্ডিয়া কাফে...টু নেম আ ফিউ। দারুণ কফির জন্য স্টারবাকস, আড্ডা হাউস; সস্তায় অনেক বাজারের জন্য ওয়ালমার্ট আর টার্গেটের জন্য সুপারস্টোর্স, যারা বইপত্র ভালোবাসে তাদের জন্য প্রেইরি লাইটস। যারা সেকেন্ড হ্যান্ড বই-এর জন্য ছটফট করে তাদের জন্য হস্টেড বুকশপ। গান শুনতে না-পেলে যারা ছটফট করে তাদের জন্য পাবলিক স্পেস বা স্যাংচুয়ারির মতো লাইভ মিউজিক ভেন্যুস। ফিল্মের জন্য সাইকোমোড বা কেরাল থিয়ে। আর হ্যাঁ, গ্রোসারির জন্য গ্রেড গার্ডেন মার্কেট, হাই ভি, আর জনস গ্রোসারি, যেটাকে আমরা ভার্টি জনস গ্রোসারি-ও বলি।

যারা ক্লাসিক জামাকাপড় খুঁজছে তারা তো ওয়ালমার্টে পাবে না। তাই রিভাইভাল, হোয়াইট র‍্যাবিট কিংবা গুডউইল-এ যেতে হবে তার জন্য। কোনও চিন্তা নেই মোটামুটি ঘন্টাখানেকের এই ট্যুরটাতে আইওয়া সিটির ফার্স্টহ্যান্ড ফিল পেয়ে যাবেন আপনারা। আর তারপর অল ইস ইওরস। কথাগুলো শেষ হলেই হাততালি দিয়ে উঠল ওর সামনে দাঁড়ানো ট্যুরিস্টের দল। আমেরিকায় মানুষের একটা বড় গুণ হল এখানে লোকে খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করতে পারে। যে কোনও ভাল কাজ, এমনকী নিজের কাজটুকুও দক্ষতার সঙ্গে করতে পারলে শোনা যায় 'আই অ্যাপ্রিসিয়েট।'

টংহং-এর ভালোলাগে শব্দটা। ও তো অ্যাপ্রিসিয়েট করে মানুষ যেখানে মানুষকে মানুষের সম্মান দিচ্ছে, মতের বিরুদ্ধে গেলেই মানুষকে চাবুক মারছে না কিংবা খাঁচার ভেতরে ভরে রাখছে না। সেই দেশ সেই সংস্কৃতিকে ও সম্মান করে। পরের কথাটা বলার আগেই টংহং নিজের ফোনটাকে বাজতে দেখে উঠল। একটা অচেনা নম্বর থেকে ফোন আসছে। সাধারণত কাজের মধ্যে ফোন ধরতে ও পছন্দ করে না। কিন্তু নম্বরটা মনে হচ্ছে কোনও দূর দেশের। এশিয়ার কোনও দেশের? কে ফোন করছে টংহং-কে? চিনের কেউ কি? সে কি জানাতে চায়? ওর বাবা সুস্থ আছে তো? কিন্তু, এই নম্বর তো চিনেরও নয়। তাহলে কোথাকার? একটু অবাক হয়ে গিয়েই নম্বরটা ধরল।

ওপাশে একটা গলা প্রথমে কি বলল, খেয়াল হল না। তারপর বুঝতে পারল যে দীপ্রর খোঁজে কেউ ওকে ফোন করেছে।

—দীপ্র? ইয়েস। ফ্রেন্ড অফ মি।

ওর জেমিকের বন্ধু। ওরও তো বন্ধু হয়ে গিয়েছে এতদিনে। দীপ্রর জন্য ওর মোবাইলে ফোন করেছে। কী হয়েছে দীপ্রর? টংহং জিজ্ঞেস করল।

ওপাশের গলাটা যে ইংরেজিতে কথা বলছিল, ও পুরোটা বুঝতে পারছিল না তা। এইটুকু বুঝল যে ও দীপ্রর খবর পায়নি। কোনও একটা ট্রিজার্ডের কথা নাকি শুনেছে। ঝড় এসেছে? এই আশেপাশে তো কোনও ঝড়ের কথা শোনেনি। তবে, কোথায়-কখন ঝড় আসে, কেই বা তার খবর রাখে?

অ্যামেসে গেলে সপ্তাহের শেষে দীপ্রর সঙ্গে দেখা হবে। কিন্তু আজকে এ মুহূর্তে দীপ্রর সঙ্গে কোনও যোগাযোগ তো নেই? প্রথমে ভাবল, মেয়েটাকে তিন-চার ঘন্টা পরে ফোন করতে বলে। কিন্তু, মেয়েটা এমন একটা উতলা হয়েছিল যে টংহং-এর কোথাও একটা খারাপ লাগল। টংহং ওকে বলল, পাঁচমিনিট পরে ফের ওকে ফোন করতে। ও তার মধ্যে দীপ্রর খবর নেওয়ার চেষ্টা করছে।

দীপ্রর ফোনে বেশ কয়েকবার ফোন করল টংহং। কিন্তু, ফোনটা বন্ধ। ও লি ইউ শানকে ফোন করল। দীপ্রর খবর জানতে চাইল। লি ইউ শান প্রথমে বলতে পারল না। তারপর বলল, খবর নিয়ে জানাচ্ছে। মিনিট সাতেকের মধ্যে ফোন করলে টংহং-এর মোবাইলে। বলল, দীপ্র তো ওই মুহূর্তে অ্যামেসে নেই। ও মোবাসার গাড়িটা নিয়ে ডিময়েনে গিয়েছে ওর গালফ্রেন্ডের কাছে। গালফ্রেন্ডের কাছে ডিময়নে গেছে দীপ্র! ইন্ডিয়া থেকে যে মেয়েটা ফোন করছে তাহলে সে ওর কে? দীপ্র কি দুটো সম্পর্কের মাঝখানে আধাআধি ভাগ হয়ে যাচ্ছে? ইন্ডিয়া আর আমেরিকার মতো? একটু পরে আবার যখন মেয়েটা ফোন করবে, ওইরকম উতলা হয়ে জানতে চাইবে দীপ্রর খবর কি বলবে টংহং তখন? দীপ্র অন্য কোনও মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছে? নাকি এমনি স্বাভাবিকভাবেই বলবে দীপ্র ঠিক আছে। ও অন্য কোনও শহরে গিয়েছে, পরে ওর সঙ্গে যোগাযোগ করে নেবে? কোনটা বলা ঠিক হবে? সেটা সত্যি সেটা? নাকি যেটা বললে কেউ কোনও আঘাত পাবে না? টংহং নিজের ভেতরে থমকে গেল একমুহূর্ত। *(চলবে)*

আইওয়া শহরের গাইড হিসেবে ও ছুটির দিনগুলোয় কাজ করে। আর আইওয়ার রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে নিজের জেলবন্দি বাবার কথা খুব মনে পড়ে ওর। ইস! বাবাকে যদি শহরটা দেখাতে পারত! এই রোদের মধ্যে, ঝকঝকে রাস্তার মধ্যে, এই রং বদলাতে থাকা গাছগুলোর মধ্যে, আমেরিকার নয়নাভিরাম 'ফল'-এর মধ্যে বাবার সঙ্গে ও যদি ঘুরে বেড়াতে পারত! মন খারাপ হয়ে যায় টংহং-এর। কিন্তু, কাজটা কাজই। আইওয়া শহর যে ট্যুরিস্টদের ও ঘুরিয়ে দেখাবে তাদের যাতে কোথাও কোনওরকম কোনও আফশোস না-থাকে সেটা দেখে নেওয়া ওর কর্তব্য।

দীপ্রর ফোনে বেশ কয়েকবার ফোন করল টংহং। কিন্তু, ফোনটা বন্ধ। ও লি ইউ শানকে ফোন করল। দীপ্রর খবর জানতে চাইল। লি ইউ শান প্রথমে বলতে পারল না। তারপর বলল, খবর নিয়ে জানাচ্ছে। মিনিট সাতেকের মধ্যে ফোন করলে টংহং-এর মোবাইলে। বলল, দীপ্র তো ওই মুহূর্তে অ্যামেসে নেই। ও মোবাসার গাড়িটা নিয়ে ডিময়েনে গিয়েছে ওর গালফ্রেন্ডের কাছে। গালফ্রেন্ডের কাছে ডিময়নে গেছে দীপ্র! ইন্ডিয়া থেকে যে মেয়েটা ফোন করছে তাহলে সে ওর কে? দীপ্র কি দুটো সম্পর্কের মাঝখানে আধাআধি ভাগ হয়ে যাচ্ছে? ইন্ডিয়া আর আমেরিকার মতো?

boierpathshala.blogspot.com

পর্ব ১২

থাকে শুধু অন্ধকার

■ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

২১

স্বপ্নে কি মানুষ ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা আবার দেখতে পারে? কে জানে! কিন্তু দীপ্র তো তাই দেখল। শুধু যার সঙ্গে ঘটনাটা ঘটেছিল, তার বদলে নিজেকে দেখতে পেল। অনেক পরে ঘুম ভাঙতে ঝিম ধরে কিছুক্ষণ বসে রইল ও। তারপর স্বপ্নটাকেই রিওয়াইন্ড করে দেখার চেষ্টা করল আচ্ছন্ন অবস্থায়।

আমেরিকায় এসে প্রথম যে হোস্টেলে ছিল সেখানে নিজের ঘরটা পছন্দ হয়নি দীপ্রর। কিন্তু তাই নিয়ে কাউকে নালিশ করার মতো সাহস বা স্পর্ধাও ছিল না। যা পেয়েছে তাই ভাগ্য বলে মেনে নিয়েছিল। খুব একটা অসুবিধে হয়নি কারণ মেনে নেওয়ার অভ্যেস তো আর নতুন করে তৈরি করতে হয়নি ওকে। ছোট থেকে হোস্টেলে ছিল বলে ওটা গায়ের চামড়ার মতোই হয়ে গিয়েছিল। ফারাক একটাই, দেশে নিজের কী চাই তাই নিয়ে মানুষ ভাবেই না খুব একটা, আমেরিকায় সেটাই জীবনের চালিকাশক্তি। দীপ্ররও তাই মনে হচ্ছিল যে একটু ভালো একটা ঘর (যার জানলা দিয়ে তাকালে পরে মস্ত দেওয়াল আর মেশিন নয়, খোলা মাঠ আর রাস্তা চোখে পড়ে) পেলে পরে মন্দ হত না।

মাথায় ওই ইচ্ছেটা ঘুরত বলেই, দু'শো চোদ্দ নম্বর ঘরটায় ঢুকলে মন ভালো হয়ে যেত ওর। কলম্বিয়া থেকে আসা এনরিকো সেরানো থাকত ওই ঘরটায়। রিসার্চ করার জন্যই আমেরিকায় এসেছিল সেরানো। কিন্তু ওর হাবভাব দেখলে মনে হত ও যেন অনন্ত এক ভ্রমণে এসেছে এই দেশটায়। একদিন ব্রেকফাস্টের পর সেরানোর ঘরে ঢুকে দীপ্র দেখল, লোকটা জানলার সামনে দাঁড়িয়ে হাতের একটা কার্ড নাচিয়ে অনর্গল কথা বলে চলেছে। প্রায় মিনিট দু'য়েক ওই একই কসরত করে গেল লোকটা ঘরে ঢুকে আসা দীপ্রর উপস্থিতি অগ্রাহ্য করে।

দীপ্র সামান্য অপ্রস্তুত হয়ে ভাবছিল যে এভাবে ঘরের দরজা খোলা পেয়ে ওর ঢুকে আসা উচিত হয়নি, সেরানো হয়তো বিরক্ত হচ্ছে...

ঠিক তখনই ওই কার্ড ন্যাচানো বন্ধ করে টেবিল থেকে তুলে দীপ্রর দিকে একটা মফিন এগিয়ে দিয়ে সেরানো বলল, ফ্রিজ টেস্ট দিস ওয়াইল্ড ব্লুবেরি মফিন। ইট ইজ ভেরি টেস্টি।

নামটা যেন জলতরঙ্গের মতো বেজে উঠল দীপ্রর মাথায়। হাতে নিয়ে এক কামড় দিতেই ভালোলাগাটা জিভ পেরিয়ে গলায় নামতে শুরু করল। কিন্তু, দ্বিতীয় কামড় দেওয়ার আগে দীপ্র জিজ্ঞেস না-করে পারল না, জানলার সামনে দাঁড়িয়ে তুমি কী করছিলে বলো তো?

—ভারি সুন্দর একটা পাখি এসে বসেছিল গাছের ওপরে। আমার মেয়েকে দেখাচ্ছিলাম পাখিটা। সেরানো একগাল হেসে বলল।

—তোমার মেয়ে? কোথায় তোমার মেয়ে? দীপ্র ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল।

সেরানো ওর গলা থেকে ঝুলতে থাকা ফিতের ডগায় ল্যামিনেট করা ছবিটা দীপ্রর মুখের কাছে তুলে ধরে বলল, হিয়ার ইজ মাই ডটার। সি ইজ আস্ট নাইন মান্থস ওল্ড।

দীপ্র আর একটাও কথা না-বলে চুপচাপ মাফিনটা খেতে খেতে ভাবল, পৃথিবীকে যখন সারাক্ষণ হিংসা আর ঘেন্নাই নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে, তখন সেরানো কী চমৎকার একটা পৃথিবী গড়ে নিয়েছে নিজের জন্য। আগেরদিনই আমেরিকার কোনও একটা ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসে কোনও এক সাইকোপ্যাথ গুলি করে আট-দশটা তাজা ছেলেমেয়েকে মেরে ফেলেছে। ফোনে মাকে খবরটা দেওয়ার সময়ও গলা কাঁপছিল দীপ্রর। কারণ, ওর ইউনিভার্সিটিতেও তো ঘটনাটা ঘটতে পারে। কিন্তু আজ সেরানোকে দেখে ওর মনে হল যে, আর যেখানেই হোক অ্যামেসে ঘটনাটা ঘটবে না। কারণ, এখানে সেরানো আছে। আছে ওর মেয়ে, যে কলম্বিয়ায় ঘুমিয়ে থেকেও মিড-ওয়েস্টের একটা পাখির বন্ধু হয়ে গিয়েছে। বাবার সৌজন্যে।

ওরা দু'জন ওদের রিসার্চের কথা, অ্যামেস শহরটার কথা আলোচনা করছিল তারপর। কিন্তু মিনিট পাঁচেকের মাথায় সেরানো বলে উঠল, এসো জানলার কাছে এসো। আবার সেই পাখিটা এসেছে। বলতে বলতে হাঁট করে আবার সেই জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল সেরানো।

দীপ্র ওর কাছে গিয়ে দেখল, সকালের রোদে একতাল সোনার রং ধারণ করা একটা পাখি, সেরানোর ঘরের জানলা থেকে যে ছোট্ট মাঠটা দেখা যায়, তার ঠিক মাঝখানে এসে বসেছে।

—আমার মেয়ে তো আমার চোখ দিয়েই দেখছে। তুমি নিজের চোখ দিয়ে দেখো। কথাটা বলেই সেরানো ফিতেটা গলায় পরে নিল আবার আর মেয়েটার ছবিটাকে উঁচু করে ধরল জানলার দিকে।

দীপ্র ওই দৃশ্যটা দেখে মনে মনে একটা নাম দিয়েছিল সেরানোর সেদিন, 'ওয়াইল্ড ব্লুবেরি মফিন'।

সেই দৃশ্যটাই একটু আগে ঘুমের মধ্যে ফিরে এল দীপ্রর কাছে। স্বপ্নের চেহারা ধরে। শুধু সেরানোর জায়গায় ও নিজেকে দেখল, জানলার সামনে ফিতে গলায় দাঁড়িয়ে থাকতে। আর ফিতের থেকে ঝোলা কার্ডটায় কোনও বাচ্চার নয়, কলকাতার একটা মেয়ের ছবি দেখল। আর স্বপ্ন ভেঙে যেতেই ওই মুখটা মনে করে শিউরে উঠল।

জীবন যখন একটা বাঁকের মুখে এনে দাঁড় করায় তখন কী করে মানুষ? একটা রাস্তা তো নিতেই হয় তাকে। কলকাতার মেয়েটার সঙ্গে কথা বলতে বলতে অনেকটা জড়িয়ে গিয়েছিল এই কয়েক মাসে। তিন-চারদিন ফোন না-করলে ফেসবুকে খোঁচা দিত মেয়েটা, মেমসাহেবদের প্রসঙ্গ তুলে। সত্যি বলতে, সেই খোঁচা খেতে মন্দ লাগত না দীপ্রর। আর কয়েকদিনের ব্যবধানে মেয়েটার গলা শুনলে ভালো লাগত আরও। কিন্তু কাল যা হল, যতটা হল, তারপর বিশাখাকে ছাড়ার কথা ভাবা যায় কি আর? বিশাখা তো আর এখন বউদি নয়, অন্য কারও বিবাহিত স্ত্রী নয়। বিশাখা এখন দীপ্রর ওপর নির্ভর করে অন্ধকার থেকে উঠে আসতে চাওয়া একটা ছায়ার নাম। ছায়াকে রোদের থেকে আলাদা

সেই দৃশ্যটাই একটু আগে ঘুমের মধ্যে ফিরে এল দীপ্রর কাছে। স্বপ্নের চেহারা ধরে। শুধু সেরানোর জায়গায় ও নিজেকে দেখল, জানলার সামনে ফিতে গলায় দাঁড়িয়ে থাকতে। আর ফিতের থেকে ঝোলা কার্ডটায় কোনও বাচ্চার নয়, কলকাতার একটা মেয়ের ছবি দেখল। আর স্বপ্ন ভেঙে যেতেই ওই মুখটা মনে করে শিউরে উঠল। জীবন যখন একটা বাঁকের মুখে এনে দাঁড় করায় তখন কী করে মানুষ? একটা রাস্তা তো নিতেই হয় তাকে। কলকাতার মেয়েটার সঙ্গে কথা বলতে বলতে অনেকটা জড়িয়ে গিয়েছিল এই কয়েক মাসে। তিন-চারদিন ফোন না-করলে ফেসবুকে খোঁচা দিত মেয়েটা, মেমসাহেবদের প্রসঙ্গ তুলে। সত্যি বলতে, সেই খোঁচা খেতে মন্দ লাগত না দীপ্রর। আর কয়েকদিনের ব্যবধানে মেয়েটার গলা শুনলে ভালো লাগত আরও। কিন্তু কাল যা হল, যতটা হল, তারপর বিশাখাকে ছাড়ার কথা ভাবা যায় কি আর? বিশাখা তো আর এখন বউদি নয়, অন্য কারও বিবাহিত স্ত্রী নয়। বিশাখা এখন দীপ্রর ওপর নির্ভর করে অন্ধকার থেকে উঠে আসতে চাওয়া একটা ছায়ার নাম। ছায়াকে রোদের থেকে আলাদা

boierpathshala.blogspot.com

করে কী করে দীপ্র?

মা কিংবা বাবা কেউই নিশ্চয়ই প্রথমেই মেনে নেবে না ওর আর বিশাখার সম্পর্কটা। চিৎকার করবে, তারপর আকুতিমিনতি, তবে দীপ্রর বিশ্বাস শেষ অবধি বোঝাতে পারবে ওদের। ও যেটা করছে সেটা হয়তো ভুল। কিন্তু বিশাখা আর ওর সম্পর্কটা যে চেহারা নিয়েছে কাল, তারপর তাকে অস্বীকার করা অন্যায় হবে।

রসায়নে হামেশাই এরকম হয় যে, দুটো বস্তুকে মিশিয়ে যা পাওয়া যাবে ভাবা গিয়েছিল, পাওয়া গেল তার থেকে একদম অন্যরকম কিছু। ওর আর বিশাখার মিশ্রণ ঠিক সেভাবেই হয়েছে যদি ধরে নেওয়া যায়? ফল যা আসছে তাকে ওর পরিবার কিংবা আত্মীয়স্বজন মানতে পারবে না। কিন্তু দীপ্র না মেনে যাবে কোথায়? বিশাখাকে কীভাবে খাদের মুখে ফেলে চলে যাবে? নাহ! যে আগুনে একসঙ্গে ঢুকেছে, সেই আগুন একসঙ্গেই পার হতে হবে।

চোখ কচলে বিছানা থেকে উঠে বিশাখাকে ডাকল দীপ্র। একবার, দু'বার। কিন্তু কোনও সাড়া পেল না। ঘরের দরজাটা খুলে ড্রয়িংরুমে এল। জানলা দিয়ে বাইরে তাকাতেই চোখে পড়ল, কোনও পাখি নয়, বিপাশা একটা গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে। গাড়িটা দৃষ্টির আড়ালে চলে যাওয়া অবধি হাত নাড়ল বিশাখা। তারপর ঘাসজমি পেরিয়ে বাড়ির দিকে আসতে লাগল।

এত ভোরে কে এসেছিল? কাকে বিদায় জানাতে বিশাখা নাইটড্রেসে বাড়ির বাইরে চলে গেল?

২২

সুচন্দ্রার কান-মাথা ঝাঁঝাঁ করছিল। ব্লক করে দিল দীপ্র ওকে? কেন? কী অপরাধ করেছে ও? কথা বলতে বলতে ভালোবেসে ফেলেছে বলে? সামনের দিনগুলো ওর সঙ্গে থাকার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে বলে? কিন্তু তার দায় তো সুচন্দ্রার একার নয়। দীপ্রর মা প্রতিক্রিয়াটা শুরু না করলে ও তো জীবনে চিনতই না ওদের। যখন চিনল তখনও ও নিজের থেকে এগোয়নি। ওর ভয় ছিল, দ্বিধা ছিল। দীপ্রর মাকে যা নয় তাই কথাও শুনিয়ে দিয়েছিল। তারপরও যে সম্পর্কটা এগিয়েছে তার কারণ দীপ্র নিজের থেকেই ফোন করতে শুরু করে ওকে। আর ছেলেটার গলার মধ্যে একটা সততা আছে বলে মনে হয়েছিল সুচন্দ্রার।

ভুল মনে হয়েছিল। জীবনের অন্যান্য অনেক ভুলের মতো এটাও ভুল। বড় মাপের ভুল। কিন্তু যে ওকে নিয়ে এই ভুলটা করাল, মজন্যানের স্বপ্ন দেখিয়ে খুরো ব্যাপারটাকেই মরীচিকায় বদলে দিল, তাকে ছাড়বে না সুচন্দ্রা। ওদের বাড়িতে গিয়ে যা বলার তা তো বলবেই, একদম ধুইয়ে কাপড় পরিয়ে দেবে দীপ্রর মা আর বাবাকে, কিন্তু সেখানেই থামবে না। আইওয়ার যে নম্বরটায় ফোন করেছিল দীপ্রর খবর জানতে চেয়ে সেখানে ফোন করে জানাবে, ছেলেটা আসলে কীরকম। একটা মেয়ের সঙ্গে ছ'মাস-সাতমাস কথা বলে, ভবিষ্যতে আমেরিকায় ওরা কীরকম বাড়ি কিনবে সেই আলোচনা করে, হঠাৎ করে একদিন ব্লক করে দেয় মেয়েটাকে।

হ্যাঁ, ব্লকই করেছে। নইলে ওর কলিগ সাধনার ফোন থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে দীপ্রকে আর ওর ফোন থেকে যাচ্ছে না, এটা কীভাবে সম্ভব? আচ্ছা হলটা কী? দীপ্র অন্য কোনও মেয়ের পাল্লায় পড়েছে? সুচন্দ্রা জানে না কেন, কিন্তু, 'পাল্লা' বা 'খপ্পর'-এর মতো শব্দগুলোই আসছিল ওর মাথায়। ও কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না, যে ছেলেটা তিনদিন আগেও ফোনে ওকে জিজ্ঞেস করেছে যে ও বড়ি-পোস্ত রাঁধতে পারে কি না, সে দুম করে কোনও আমেরিকান মেয়ের সঙ্গে শুয়ে পড়বে।

—তুমি কেন ভাবছ যে আমেরিকান কারও পাল্লাতেই পড়েছে? সোমবার দিন সাধনা ওকে বলল। সাধনা শ্রীবাস্তব অবাঙালি বলেই ওর ফোন থেকে বারংবার দীপ্রর ফেসবুক চেক করছিল সুচন্দ্রা। বাঙালি হলেই গসিপ শুরু করত আর গসিপে ওর অরুচি। কিন্তু রোববার ও সাধনাকে পাবে কোথায়? সে তো সেই খড়দায় থাকে! নিজের আর একটা

সুচন্দ্রার দিকে এগিয়ে দিল সাধনা নিজের মোবাইলটা। সুচন্দ্রা মোবাইলটা হাতে নিয়ে দেখল ফেসবুকে দীপ্রর প্রোফাইল পিকচার বদলে গিয়েছে। পুলওভার পরে অ্যামেসের রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা ছবিটার বদলে একটা অন্য মেয়ের কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছবি সেখানে। না, মেয়েটা কোনও শ্বেতাঙ্গিনী নয়। বাঙালিই। হাসছে। দীপ্রর পাশে দাঁড়িয়ে। ছবিটার নীচে কমেন্টগুলো পড়ার মতো ধৈর্য সুচন্দ্রার হল না। ওর মাথার মধ্যে দাবানল আর সুনামি একসঙ্গে খেলা করছিল। মনে হচ্ছিল চোখ ফেটে যাবে, রাগে অপমানে। কিন্তু অফিসে তো আর সেসব দেখানো যায় না। নিজেকে যতটা সম্ভব সংযত করে সুচন্দ্রা তাই আবারও একবার দীপ্রর নতুন প্রোফাইল পিকচারটার দিকে তাকাল।

আকাউন্ট বানিয়ে সেখান থেকে দীপ্রকে ট্র্যাক করবে ভাবছিল কিন্তু কীরকম যেন জোর পেল না। বারদুয়েক সাধনাকে ফোন করল শুধু।

সাধনা তখন ততকিছু না বললেও সোমবার বলল কথাটা। আর কেন জিজ্ঞেস করছে জানতে চাইলে সুচন্দ্রার দিকে এগিয়ে দিল নিজের মোবাইলটা। সুচন্দ্রা মোবাইলটা হাতে নিয়ে দেখল ফেসবুকে দীপ্রর প্রোফাইল পিকচার বদলে গিয়েছে। পলওভার পরে অ্যামেসের রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা ছবিটার বদলে একটা অন্য মেয়ের কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছবি সেখানে। না, মেয়েটা কোনও শ্বেতাঙ্গিনী নয়। বাঙালিই। হাসছে। দীপ্রর পাশে দাঁড়িয়ে।

ছবিটার নীচে কমেন্টগুলো পড়ার মতো ধৈর্য সুচন্দ্রার হল না। ওর মাথার মধ্যে দাবানল আর সুনামি একসঙ্গে খেলা করছিল। মনে হচ্ছিল চোখ ফেটে যাবে, রাগে অপমানে। কিন্তু অফিসে তো আর সেসব দেখানো যায় না। নিজেকে যতটা সম্ভব সংযত করে সুচন্দ্রা তাই আবারও একবার দীপ্রর নতুন প্রোফাইল পিকচারটার দিকে তাকাল।

মেয়েটার হাসিটা এত চেনা লাগছে কেন? কোথায় দেখেছে সুচন্দ্রা এই হাসি? নাকি এটা নেহাতই ভ্রম? স্বপ্ন ভেঙে উড়িয়ে গেল যার জন্য, তাকে চেনা বলে মনে হওয়ার ভ্রম?

২৩

—তুই কি রামমোহন না বিদ্যাসাগর? বিধবাদের উদ্ধার করছিস? মা চিৎকার করে উঠল ফোনের ওপাশে।

—উদ্ধারের কোনও প্রশ্ন উঠছে না কারণ সে ক্ষমতাই আমার নেই। বরং সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে বিশাখাই আমাকে উদ্ধার করেছে। ও গ্রিন কার্ড হোল্ডার। দু'দিন পর সিটিজেন হয়ে যাবে।

—তুই তাহলে আমেরিকান সিটিজেন হওয়ার জন্য বিয়ে করছিস? তোর রিসার্চ কমপ্লিট হল না, চাকরি পেলি না, তুই বিয়ে করে নিচ্ছিস কোন আক্কেলে?

—করব তো ভাবিনি। পাকেচক্রে...

—ট্র্যাপে পড়েছিস তুই, বেরিয়ে আয়। নিজের জীবন আর পরিবারের সুনাম একসঙ্গে দুটোই নষ্ট করিস না।

—আমার জীবন এতে নষ্ট হচ্ছে না, বরং সুবিধেই হবে। আর পরিবারের সুনাম নিয়ে আমি চিন্তিত নই। আজকাল সুনাম ধুয়ে জল খায় না কেউ।

—তার মানে তুই আমাদের কেউ ছোস না? ভালো। তোর পরিচয়ও আমরা কেউ দেব না বাইরে। আমি কিংবা তোর বাবা মরলে মুখাগ্নি করার জন্যেও শ্মশানে আসিস না তুই। এটাই আমার শেষ কথা। মা কেঁদে ফেলল।

—মা তুমি এভাবে কেন রিয়্যাক্ট করছ? আমি যদি কারও সঙ্গে সুখে থাকি তাহলে তোমারও তো তাতে সুখী হওয়ার কথা, তাই না?

—তুই আমার আর তোর বাবার সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দিবি আর আমরা খুব সুখে থাকব? তোকে আমি আবারও বলছি ওই বদ মেয়েছেলেটা তোকে ফাঁদে ফেলেছে। ছিবড়ে করে রাস্তায় ফেলে দেবে। তার চেয়ে যে মেয়েটাকে তোর জন্য দেখেছি, যার সঙ্গে এতদিন ধরে কথা বললি...

—কথা বললেই, বিয়ে করব, সেই দাসখত লিখে দিইনি কাউকে।

—তা দেবে কেন? তোমাকে তো এখন ওই ডাইনি গিলে ফেলেছে!

—মা তুমি এই ভাষায় বিশাখার সম্বন্ধে কথা বলবে না। ও আমার স্ত্রী এখন...

—ছ'মাস আগে শান্তনুদার বউ বলতে অজ্ঞান ছিলি। আজ হঠাৎ নিজের বউ বলতে লজ্জা করছে না?

—শান্তনুদা মারা গিয়েছে মা।

—মারা গিয়েছে কি না তুই জানলি কী করে? কাঁধে করে ডেডবডি নিয়ে 'বলো হরি/হরিবোল' ধ্বনি দিতে দিতে হেঁটেছিস রাস্তা দিয়ে? ওর হাজব্যান্ড যে মরা গিয়েছে, কী গ্যারান্টি তার? দেখ গিয়ে তোকে ফাঁসানোর জন্য ওই হারামজাদি নাটক ফেঁদেছে।

—ছি! ছি! তুমি এইসব কী ভাবছ মা? আমায় নিয়ে তোমার এক্সপেরিমেন্ট সফল হয়নি বলে যা নয় তাই বলতে হবে?

—এক্সপেরিমেন্ট? আমি যা চাইছিলাম তোর জন্য সেটা এক্সপেরিমেন্ট? আর তুই নিজে যেটা করছিস সেটা কী?

—আমি পরে তোমায় ডিটেলে বুঝিয়ে বলব। তুমি একবার বিশাখার সঙ্গেও কথা বলে দেখো, দরকার হলে স্কাইপে দেখো ওকে, তোমার ভুল ধারণা বদলাবেই আমি নিশ্চিত।

—না। খবরদার আমার সঙ্গে কথা বলাতে আসবি না। আমার যা বোঝার বোঝা হয়ে গিয়েছে। কী করেছিস তুই মেয়েটার সঙ্গে? প্রেগন্যান্ট করে দিয়েছিস নাকি? নাকি অন্যের বাচ্চা তোর বলে চালাচ্ছে?

—আমার ভাবতে লজ্জা করছে যে আমার মা একজন মহিলা সম্বন্ধে এরকম ভাষায় কথা বলছে!

—আমারও ভাবতে ঘেন্না করছে যে তোর মতো কাউকে আমি দশ মাস দশ দিন পেটে ধরেছিলাম। তুই আর কোনওদিন ফোন করবি না আমাকে বা তোর বাবাকে। তোর বোনকেও নয়। আমরা তোর সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখতে চাই না।

মা ফোনটা কেটে দিল।

দীপ্র স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। মা রেগে যাবে আন্দাজ করেছিল কিন্তু তাই বলে এতটা রিয়্যাক্ট করবে তা ভাবতে পারেনি। প্রত্যেকেই কি তবে অন্যের উপর নিজেকে চাপিয়ে দিতে চায়?

সপ্তাহে পাঁচদিন অ্যামেসে থাকত আর শুক্রবার বিকেল হলেই ডি-ম্যারেনের উদ্দেশে রওনা দিত দীপ্র। গাড়ি চালানো শিখে নিয়েছিল। না শিখে উপায় ছিল না, বিশাখা নিজেই গাড়িটা কিনে দেওয়ার পর।

—এটা তোমার ওয়েডিং গিফট। বিশাখা বলেছিল।

যে মেয়েটা ওর থেকে নেয়নি কিছু, চায়ওনি, শুধু নিয়ে গিয়েছে। তাকে কীভাবে খারাপ ভাববে দীপ্র? হ্যাঁ, দীপ্রর ভালোবাসায় নতুন করে বাঁচতে চেয়েছে বিশাখা। কিন্তু বাঁচতে চাওয়াটা কি অপরাধ? দীপ্র হয়তো সুচন্দ্রাকে দুম করে ব্লক করে অন্যায় করেছে, কিন্তু ও তো পুরো ব্যাপারটা সাধ্যমতো এক্সপ্লেইন করেছে পরে মেসেজ লিখে। কই, তার কোনও উত্তর তো দেয়নি ওর মায়ের ক্যান্ডিডেট।

—তুমি একটা ভুল করছ দীপ্র। দু'জন মানুষ নিজেদের মতো করে সুখী হলেও তৃতীয় কেউ ততক্ষণ খুশি হয় না যতক্ষণ না ওই দু'জন তার উপর কিছুটা হলেও ডিপেন্ড করছে।

—কিন্তু আমেরিকা থেকে ইন্ডিয়্যা তো...

—তোমার মা চাইছিলেন যে তুমি সারাজীবন ওনার উপর নির্ভরশীল থাক। ওঁর দেখিয়ে দেওয়া রাস্তায়, ওঁর এগিয়ে দেওয়া লাঠিটা হাতে নিয়ে হাঁটো। কিন্তু তুমি তো আর তা পারো না, তাই না? তোমার বিশাখাকে ছেড়ে?

—না। পারি না। বিশাখার আলিঙ্গনের ভিতর থেকে বলে উঠল দীপ্র।

—পারতে চাও?

—না।

—তাহলে চলো আমরা হানিমুনে যাই। নতুন বিয়ের পর হানিমুনে যাব না? বিশাখা একটা চুমু খেল দীপ্রর গালে।

হানিমুনে কোথায় গেলে ভালো হয় তাই নিয়ে কথা বলতে গিয়ে দীপ্র আলটপকা বলে ফেলল, মা মনে করে শান্তনুদা মারা যায়নি, বেঁচে আছে।

বিশাখা কীরকম একটা অদ্ভুত চোখে দীপ্রর দিকে তাকাল কথাটা শুনে। তারপর বলল, তুমিও তাই মনে করো নাকি?

দীপ্র কথাটার জবাব না দিয়ে প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দিল।

ক্লান্ত ছিল বলে সেদিন তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে গিয়েছিল দীপ্র। ঘুম ভাঙতেই দেখল ওর গায়ের উপরে একটা অফ হোয়াইট শার্ট। শার্টটায় রক্তের দাগ শুকনো হয়ে লেগে আছে।

শার্টটা হাতে নিয়ে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল দীপ্র, বিশাখা!

আওয়াজটা প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল ওর কাছেই।

দীপ্র ঘামতে শুরু করল। *(চলবে)*

boierpathshala.blogspot.com

পর্ব ১৩

থাকে শুধু অন্ধকার

■ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

২৪

দীপ্রর ল্যাবে হাঙ্গেরির একটা ছেলে কাজ করছিল 'জ্বালা' নিয়ে। দু'ধরনের অ্যান্টিসেপটিক লবাই জেনে মোটামুটি। প্রথমটা গায়ের সঙ্গে লাগলে জ্বালা হয় আর দ্বিতীয়টা লাগলে পরে জ্বালা হয় না। ক্ষত লুটোতেই সেরে যায়, কিন্তু ঠিক কী ফারাক হয়, জ্বালা ধরানো কম্পোজিশন অ্যান্টিসেপটিকের মধ্যে থাকলে বা না থাকলে তাই নিয়েই গবেষণা করত ছেলেটা।

মাঝেমাঝে ওই ছেলেটার সামনে গিয়ে দাঁড়াত দীপ্র। আর তখনই ওর মনে হত যে মানুষও আসলে দু'ধরনের। একদলের সংস্পর্শে এলে গায়ে জ্বালা হয়। আর একদলের সংস্পর্শে এলে হয় না।

রাম্রাভান সেট্রেসকু বলে ওই ছেলেটা আসতে রোমানিয়ার কিন্তু অল্পবয়সে হাঙ্গেরিতে চলে এসেছিল। ও যখন গল্প করত তখন ওর দুশপট বর্ণনার মধ্যে রোমানিয়া আর হাঙ্গেরি কীভাবে যেন মিশে যেত। হাঙ্গেরির নদীর কথা বলতে বলতে ও একসময় একটা ঘোরের মধ্যে থেকে উঠে এসে বলত যে নদীটা আসলে হাঙ্গেরির না, রোমানিয়ার।

বিশাখার সঙ্গে সংসারে জড়িয়ে যাওয়ার পর, শান্তনুদার বাড়িটাকেই নিজের বলে ভাবতে শুরু করেও মাঝেমাঝে একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে যেত দীপ্র। ওর মনে হত সত্যিই কি ও এই বাড়ির কর্তা, নাকি নেহাতই এক আশ্রিত যে পাকেচক্রে মালিক হতে চাইছে?

একদিন সন্ধেবেলা ল্যাব থেকে বেরিয়ে বাচ্চাদের একটা মিছিল দেখে থমকে গেল দীপ্র। মিছিল যে আমেরিকায় একদম হয় না তা নয়, তবে এভাবে বারো-চোদ্দ বছরের বাচ্চাদের প্ল্যাকার্ড হাতে রাস্তায় দেখেনি ও। সেই মিছিলে অ্যাফ্রো-আমেরিকান কৃষ্ণাঙ্গরা যেমন আছে, তেমনই আছে মেক্সিকান কিংবা চিনেরাও। ব্যাপারটা কী সেটা বোঝার জন্য একটু দাঁড়িয়ে গেল দীপ্র। প্রায় পঞ্চাশটা বাচ্চা হাঁটতে হাঁটতে স্লোগান দিচ্ছে, 'উই উইল নট গো বাক'। ব্যাপারটা কী? কোথায় ফিরতে চাইছে না? কোত্থেকে ফিরতে চাইছে না?

মোবাথা কখন এসে ওর পাশে দাঁড়িয়েছে খেয়াল করেনি দীপ্র। হঠাৎ ওর হাতটা কাঁধে এসে পড়তে চমকে তাকাল।

—এই বাচ্চাগুলোকে আমেরিকা তাড়িয়ে দিতে চাইছে, কিন্তু ওরা জানে না কোথায় যাবে। মোবাথা বলল।

—মানে? কী দোষ করেছে ওরা?

—ওরা আমেরিকায় এসে পড়েছে এটাই তো সবচেয়ে বড় দোষ। জঙ্গল টপকে, সমুদ্র সাঁতরে ওরা এই দেশটার ভিতর ঢুকে পড়েছে। ঢুকে পড়ুক কেউ তা চায়নি, কিন্তু ঢুকে পড়ার পর এদের মেনে নেওয়া হত। আগের সরকার তো এদের একটা নামও দিয়েছিল, 'ড্রিমার্স'।

প্ল্যাকার্ডে প্ল্যাকার্ডে লেখা 'দ্য ড্রিমার্স আর হিয়ার টু স্টে', 'হ্যান্ডস অফ ডাকা'। দীপ্র একটু অন্যমনস্কভাবেই জিজ্ঞেস করল, নতুন সরকার কী বলছে?

—তুমি কাগজ পড়ো না? টিভি দেখো না? হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল মোবাথা।

দু'দিন পরের এক রাতে বিশাখা অবশ্য হাসল না দীপ্রর কথা শুনে। গম্ভীর গলায় বলল, 'ডাকা' হচ্ছে, 'ডেফার্ড অ্যাকশন ফর চাইল্ডহুড আরাইভালস'। এই আইনটা যতদিন ছিল ততদিন কাগজপত্র ছাড়া এদেশে ঢুকে আসা বাচ্চারা পড়াশোনা আর কাজ করার সুযোগ পেত দু'বছর করে।

—আর দু'বছর পর?

—দু'বছর পরপর পারমিটটা রিনিউ করা যেত।

—চমৎকার। তাহলে এটা নিষিদ্ধ করে দিচ্ছে কেন?

বিশাখা একটু ঘন হয়ে বসল, না করেই বা কী করবে? গণ্ডায় গণ্ডায় বাবা-মা বাচ্চাদের সমুদ্রের জলে ফেলে দিচ্ছে যাতে তারা সাঁতার কেটে আমেরিকায় পৌঁছে যেতে পারে। এই বাচ্চাগুলো এখানে হোটেলে ওয়েটারের কাজ করবে, টয়লেট সাফ করবে বাড়িতে বাড়িতে আর ওরা আঠেরো হলে, ওদের ওপর নির্ভরশীল দেখিয়ে পুরো গ্রিন কার্ড চলে আসবে ইউএসএতে। সাদা চামড়ারা ক'দিন মেনে নেবে বলো তো?

—কিন্তু এই সাদারাও তো আর আমেরিকার নেটিভ নয়। তারাও তো কোথাও না কোথাও থেকে এসেই সেটল করেছে এখানে।

—সে বহু শতাব্দী আগের কথা। আমরা আজকের পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলছি। বিশাখা দীপ্রর গালে নিজের গালটা ঘসে দিয়ে বলল।

—কিন্তু আজকের পরিস্থিতি কী কাল বাদ দিয়ে হয়?

—তুমি এখনও আমায় শান্তনুর বউ বলেই ভাবো তাই না? হঠাৎ রেগে উঠল বিশাখা।

—তা কেন ভাবব?

—ভাবো। প্রতি মুহূর্তে সেটা বুঝতে পারি বলেই ক্ষতবিক্ষত হই। মনে হয়, আমি একরকম জেরা করে তোমায় আমার জীবনে টেনে এনেছি। আসতে চাওনি তাও এনেছি।

—প্লিজ তুমি এভাবে ভেবো না। আমি কিন্তু কিছু মিন করে...

—তুমি আমায় স্ট্রোক দিও না তো। সেই যখন চমকে উঠেছিলে শান্তনুর ওই শার্টটা দেখে তারপর অন্তত তোমার মাথা থেকে সব সংশয়, সব সন্দেহ বেরিয়ে যাবে, আমি আশা করেছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি...

—না বিশাখা, ভুল দেখছ। আমি জাস্ট একটা কথার কথা বলেছিলাম তোমায়। তাও মা কথাটা বলেছিল বলে...

—তোমার মা, তোমার বাড়ি, এর ভিতরে আমি

একদিন সন্ধেবেলা ল্যাব থেকে বেরিয়ে বাচ্চাদের একটা মিছিল দেখে থমকে গেল দীপ্র। মিছিল যে আমেরিকায় একদম হয় না তা নয়, তবে এভাবে বারো-চোদ্দ বছরের বাচ্চাদের প্ল্যাকার্ড হাতে রাস্তায় দেখেনি ও। সেই মিছিলে অ্যাফ্রো-আমেরিকান কৃষ্ণাঙ্গরা যেমন আছে, তেমনই আছে মেক্সিকান কিংবা চিনেরাও। ব্যাপারটা কী সেটা বোঝার জন্য একটু দাঁড়িয়ে গেল দীপ্র। প্রায় পঞ্চাশটা বাচ্চা হাঁটতে হাঁটতে স্লোগান দিচ্ছে, 'উই উইল নট গো বাক'। ব্যাপারটা কী? কোথায় ফিরতে চাইছে না? কোত্থেকে ফিরতে চাইছে না? মোবাথা কখন এসে ওর পাশে দাঁড়িয়েছে খেয়াল করেনি দীপ্র। হঠাৎ ওর হাতটা কাঁধে এসে পড়তে চমকে তাকাল।

হংকং না জাপান? বলো তোমার কোনটা পছন্দ? দীপ্রর মুখটা নিজের বুকের উপর চেপে ধরল বিশাখা। দীপ্রর খুব ভালো লাগতে পারত মুহূর্তটা। কিন্তু, বিশাখার হাতের ছোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে যাওয়া ঘরটায় ওর মাথার মধ্যে ভেসে উঠল ওই প্ল্যাকার্ড হাতে রাস্তায় হাঁটতে থাকা বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলোর মুখ। ওরা যেমন 'ড্রিমার্স', দীপ্র নিজেও কি তাই নয়? এই দেশটায় বাঁচবে, বড় হবে, পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পাবে, সেই স্বপ্ন তো ওরও চালিকাশক্তি। বিশাখা নিশ্চয়ই সেই স্বপ্নপূরণের পথে ওর সহায় হতে পারে। কিন্তু ওই যে একটা রক্তমাখা শার্ট, ওর আর বিশাখার মধ্যে, ওটা সরে গিয়েও সরে যায় না কেন?

boierpathshala.blogspot.com

কোথায় বলো তো? আদৌ কি কোথাও আছি? আমার কি মনে হয় জানো দীপ্র, ওই রক্তমাখা শার্টটা তুমি তোমার মাথার ভিতর বয়ে বেড়াচ্ছ।

—কী আবোলতাবোল বকছ?

—একদম ঠিক বলছি। শান্তনু মরে গিয়েছে সেটা বোঝাতেই ওই শার্টটা তোমার বিছানায় ফেলে এসেছিলাম। কিন্তু তুমি যে ওটা ক্যারি ফরওয়ার্ড করে চলবে, আমার ধারণা ছিল না।

—ইউ আর গেটিং মি রং ডার্লিং। অর্ক জড়িয়ে ধরল বিশাখাকে।

বিশাখা নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা না করেই বলল, আই অ্যাম নেভার রং। আমাদের অফিশিয়াল বিয়ের ব্যাপারে কোনও আগ্রহ তো দেখি না তোমার।

—তুমি যখন বলবে। আমি তো তোমার ওপর সব ছেড়ে দিয়ে বসে আছি।

—উফফ দীপ্র, মেয়েরা সবকিছু নিজের হাতে নিতে ভালোবাসে না। তোমাকে প্রো-অ্যাকটিভ হতে হবে। এরপর তুমি বলবে, কোথায় হানিমুনে যাব, সেটাও আমি ঠিক করব।

—তুমিই তো করবে। আমার থেকে এইসব ব্যাপার অনেক ভালো বোঝ তুমি। আর তাছাড়া বিশাখা...

—তাছাড়া কী?

—আমি একটা ব্যাপারে কুণ্ঠিত থাকি, সেটা তুমি নিশ্চয়ই বোঝ। টাকাপয়সার দিক দিয়ে আমি প্রায় কিছুই কনট্রিবিউট করতে পারি না সংসারে।

—তাতে কী? আমি চেয়েছি তোমার থেকে?

—জানি। কিন্তু আমার ভিতর তো ব্যাপারটা খচখচ করে, তাই না?

—করবেই তো। যতদিন আমায় আপন ভাবতে পারবে না ততদিন করবে। যেদিন বিশ্বাস করতে পারবে যে আমার যা আছে তার সবটাই তোমার, সেদিন আর খচখচানিটা থাকবে না দেখো।

—কিন্তু তুমি টাকা পাবে কোত্থেকে?

—সে চিন্তা তোমায় করতে হবে না। তুমি মন দিয়ে নিজের রিসার্চ শেষ করো। আরে বাবা আমি তো শান্তনুর ডেথ বেনিফিট পেয়েছি। আর সেই টাকাটা খুব একটা কম নয়। তাছাড়া আমি আবার আমার ফ্লোরিস্টের চাকরিটায় জয়েন করেছি। আমি ফুলের গন্ধ শুঁকে বলে দিতে পারি সেটা ক'দিনের। তাই ওরাও কদর করে আমার।

—তুমি এত ফুল চেনো আমায় আগে বলোনি!

—চিনি বলেই তো বাগানের সবচেয়ে তাজা ফুলটাকে নিজের জন্য বেছেছি। এবার বলো তো সোনা, কোথায় যাব আমরা হানিমুনে?

বিশাখা এমনভাবে প্রশ্নটা করল যেন কোন বাজারে মাছ কিনতে যাবে, জিজ্ঞেস করছে।

—হংকং না জাপান? বলো তোমার কোনটা পছন্দ? দীপ্রর মুখটা নিজের বুকের উপর চেপে ধরল বিশাখা। দীপ্রর খুব ভাল লাগতে পারত মুহূর্তটা। কিন্তু বিশাখার হাতের ছোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে যাওয়া ঘরটায় ওর মাথার মধ্যে ভেসে উঠল ওই প্ল্যাকার্ড হাতে রাস্তায় হাঁটতে থাকা বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলোর মুখ। ওরা যেমন 'ড্রিমার্স', দীপ্র নিজেও কি তাই নয়? এই দেশটায় বাঁচবে, বড় হবে, পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পাবে, সেই স্বপ্ন তো ওরও চালিকাশক্তি। বিশাখা নিশ্চয়ই সেই স্বপ্নপূরণের পথে ওর সহায় হতে পারে কিন্তু ওই যে একটা রক্তমাখা শার্ট, ওর আর বিশাখার মধ্যে, ওটা সরে গিয়েও সরে যায় না কেন?

২৫

সুচন্দ্রা নিজেই নিজের ফর্ম ফিল-আপ করল ছোট্ট ঘরটায় বসে। নাম, পেশা, কীরকম চাহিদা সবকিছু লিখল। লিখতে লিখতে ওর চোখ ভরে যাচ্ছিল জলে, বারবার মনে পড়ছিল, দীপ্রর সঙ্গে টুকরো-টুকরো কথাবার্তার স্মৃতি। নতুন কোনও জায়গায় গেলে, নতুন কিছু দেখলে, ওকে ফোনে জানাত দীপ্র। সেই ফোনগুলো একঘণ্টা-দেড়ঘণ্টা চলত আর ফোন রেখে দেওয়ার পরও সুচন্দ্রার মাথার মধ্যে বাজত কথাগুলো কখনও কখনও সারারাত। এমনকী পরদিনও। সেই যেবার বুল-ফাইটিং দেখতে গিয়েছিল দীপ্র, আইওয়ারই কোনও গ্রামে আর সেখান থেকে ফিরে সারাক্ষণ গল্প করছিল, কেমন করে ক্ষ্যাপা ষাঁড়গুলো দৌড়ে আসছিল আর লাফ দিয়ে তার ওপরে চেপে বসছিল, এক-একটা লোক।

—যদি কেউ লাফ দিয়ে উঠে বসতে না পারে? সুচন্দ্রা জিজ্ঞেস করেছিল।

—বাপরে! সেই লোকটা ষাঁড়ের পায়ের তলায় পিষে যাবে। দীপ্র জবাব দিয়েছিল।

এই ম্যাট্রিমনি সেন্টারের অফিসে বসে সুচন্দ্রার মনে হচ্ছিল যে ওই ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতোই দীপ্র ওর জীবনে এসেছিল, আর ও লাফ দিয়ে পিঠে উঠে কবজা করতে পারেনি বলে ওকে পায়ে পিষে দিয়ে চলে গিয়েছে।

—আপনি কি কলকাতার ভিতরেই সেটল করতে চাইছেন? ম্যাট্রিমনি সেন্টারের মেয়েটা জিজ্ঞেস করল।

—সেরকম কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। কীরকম একটা ঘড়ঘড়ে গলায় জবাব দিল সুচন্দ্রা।

এখন তো সবাই নিজেরটা নিজেই দেখে নেয়। প্রোফাইল খোলে, ইন্টারেস্ট পাঠায়, তারপর চ্যাট করে। তারপর ছাদনাতলায় গিয়ে দাঁড়ায়। সুচন্দ্রাকে অনেকেই বলেছে। কিন্তু সুচন্দ্রা আর পারবে না সেটা। একজনের সঙ্গে যেভাবে মিশেছে, যতটা উন্মুক্ত করে দিয়েছে মনের সমস্ত আবেগ, আবার নতুন করে কারও সঙ্গে তা করা সম্ভব নয়। আচ্ছা, যাকে কোনওদিন চোখেই দেখেনি তার প্রতি এতটা ভালোবাসা জন্মানো সম্ভব? নিজের মনে আসা এই প্রশ্নের উত্তর নিজেই খুঁজে পেয়েছে সুচন্দ্রা। সম্ভব যদি না-হত তাহলে পরে তো অন্ধরা কেউ কোনওদিন কাউকে ভালোবাসতেই পারত না। ওই অন্ধের মতোই দীপ্রকে অনুভব করেছে সুচন্দ্রা, ওর কণ্ঠস্বরের মধ্যে। ফোনের ওপাশ থেকে দীপ্রর বলে যাওয়া শব্দের রঙেই ওর পান্না সবুজ হয়ে উঠেছে, চুনি হয়ে উঠেছে রাঙা। কীভাবে যে ওই শব্দগুলোকে নিজের শ্রুতি আর সত্তা থেকে সরায় সুচন্দ্রা।

—একজন পাত্রের কথা আপনাকে বলতে পারি। খুবই এস্টাবলিশড। বয়স হয়তো আপনার তুলনায় সামান্য বেশি কিন্তু দেখে মনে হয় না। তাছাড়া কথা বলে যেটুকু বুঝেছি খুবই জেন্টলম্যান।

কথা বলে মানুষকে বোঝা যায় বুঝি? মনে মনেই হাসল সুচন্দ্রা। তারপর জিজ্ঞেস করল, কী করেন এই ভদ্রলোক?

—ইঞ্জিনিয়ার। খুব উঁচুদরের। সেদিক থেকে অসুবিধে নেই। অসুবিধে একটাই। ওনার আগে একবার বিয়ে হয়েছিল। সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে স্ত্রী মারা যান। স্যাড কেস।

জীবনে এমনিতেই স্যাডনেসের কোনও অভাব নেই, তার উপরে স্যাড কেসের সঙ্গে নিজেকে জড়ানোর আর কোনও মানে হয় না। সুচন্দ্রা ভাবল।

ওকে চুপ করে থাকতে দেখে সেন্টারের ভদ্রমহিলা বললেন, ভাববেন না আপনাকে প্রেশারাইজ করার জন্য কথাগুলো বলছি। তবে আপনি চাইলে একবার এমনিই কথা বলে দেখতে পারেন ভদ্রলোকের সঙ্গে। উনি কয়েকদিনের জন্য কলকাতায় এসেছেন। হয়তো আরও একসপ্তাহ থাকবেন।

সুচন্দ্রা অর্ধেক শুনেছে আর বাকি অর্ধেক শোনেনি এমনভাবে জিজ্ঞেস করল, কলকাতায় এসেছেন, মানে? কোথায় থাকেন?

—নিউ জার্সিতে। ভদ্রমহিলা বললেন।

—কোথায়?

—আমেরিকায়। আপনার ওই দেশে সেটল করতে আপত্তি আছে?

বাড়ি ফেরার পথে, ফিরে এসে সারাক্ষণ সুচন্দ্রা ভাবছিল ভদ্রমহিলার ওই প্রশ্নটার কথা। আমেরিকায় সেটল করতে আপত্তি থাকলে দীপ্রর সঙ্গে এত কথা বলত কেন? আবার এটাও ঠিক যে দীপ্র যদি ওকে উগান্ডা কিংবা ভানজানিয়ায় নিয়ে যেত, সেখানেও খুশি মনেই চলে যেত সুচন্দ্রা। দীপ্রর সঙ্গে থাকছে, তার চাইতে বড় আনন্দের আর কীই বা হতে পারত?

কিন্তু তা যখন হয়নি তখন কেন সেই দেশেই ও থাকবে না, দীপ্র নিজেও যেখানে আছে?

—তুই কি ওকে দেখাতে চাইছিস যে তুইও আমেরিকায় যেতে পারিস? নইলে একটা লোক, যার আগে একবার বিয়ে হয়ে বউ মারা গিয়েছে তার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে চাইছিস কেন? কিছুটা বিরক্ত হয়েই মা জিজ্ঞেস করল সুচন্দ্রাকে।

—বউ মারা গেলে কি লোকে আর বিয়ে করে না? সুচন্দ্রা কিছুটা মিনমিন করেই বলল।

—সে করতেই পারে। কিন্তু তোকে কেন?

দেখা করলেই তো আর বিয়ে হয়ে যাচ্ছে না, ইত্যাদি কথা বলে মায়ের সামনে থেকে সরে এল সুচন্দ্রা। কিন্তু বালিশে মুখ দিয়ে ওর মনে হল, মা যা বলছে তা কি ভুল? ও তো সত্যিই দীপ্রকে দেখিয়ে দিতে চাইছে।

কিংবা কে জানে হয়তো দেখতে চাইছে আর একবার। আমেরিকা থেকে ওই বিদেশি মেয়েটা ওকে একবার ফোন করে বলেছিল, 'ডোন্ট ওয়ারি, দীপ্র উইল গেট বাক'। মেয়েটা যে ওকে স্বান্ত্বনা দিচ্ছে বুঝতে পেরেও ওই কথাগুলো ভালো লেগেছিল সুচন্দ্রার। মনে হয়েছিল সাত সমুদ্র দূর থেকে কেউ একটা তার কষ্ট বুঝছে। আর কষ্ট যে বোঝে সে তো আর অচেনা থাকে না। আচ্ছা আমেরিকায় গিয়ে ও যদি দীপ্রর মুখোমুখি দাঁড়ায় দীপ্র চিনতে পারবে ওকে? যদি নিজের পরিচয় দেয় সুচন্দ্রা তাহলেও না-চেনার ভান করে সরে যাবে নাকি দাঁড়িয়ে কথা বলবে দু'দণ্ড?

যে ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার কথা, তার ছবি কিংবা পরিচয় কিছু নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে সুচন্দ্রা ওর মোবাইলে নেট অন করে দেখতে চেষ্টা করল, নিউ জার্সি থেকে আমেস কতটা দূরে। ঠিক ক'হাজার কিলোমিটার? পৌঁছতে কতক্ষণ সময় লাগে? আর সেটা করতে গিয়ে ফেসবুকে নিজের প্রোফাইল থেকেই দীপ্রর প্রোফাইলে গেল একবার।

ব্লক তুলে দিয়ে ওকে লম্বা একটা মেসেজ পাঠিয়েছিল দীপ্র। এই বিয়েটা কেন ওকে করতে হয়েছে, কী পরিস্থিতিতে, সেসব জানিয়ে। খানিকটা পড়ার পর আর পড়তেও ইচ্ছে হয়নি সুচন্দ্রার। আজও হল না। বরং দীপ্রর ছবিগুলোই দেখল আর একবার। না নতুন ছবি তেমন একটা নেই, যা আছে তার সবই পুরোনো। কিন্তু একটা ছবি যোগ হয়েছে প্রোফাইলে। দীপ্রর না, ওর সঙ্গিনীর। আর সেই ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই মাথায় যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল সুচন্দ্রার। বহুবছর আগের কথা তবু, সেই নাক, সেই চোখ। সেই হাসি।

কী যেন নাম ছিল মেয়েটার?

(চলবে)

এখন তো সবাই নিজেরটা নিজেই দেখে নেয়। প্রোফাইল খোলে, ইন্টারেস্ট পাঠায়, তারপর চ্যাট করে। তারপর ছাদনাতলায় গিয়ে দাঁড়ায়। সুচন্দ্রাকে অনেকেই বলেছে। কিন্তু সুচন্দ্রা আর পারবে না সেটা। একজনের সঙ্গে যেভাবে মিশেছে, যতটা উন্মুক্ত করে দিয়েছে মনের সমস্ত আবেগ, আবার নতুন করে কারও সঙ্গে তা করা সম্ভব নয়। আচ্ছা, যাকে কোনওদিন চোখেই দেখেনি, তার প্রতি এতটা ভালোবাসা জন্মানো সম্ভব? নিজের মনে আসা এই প্রশ্নের উত্তর নিজেই খুঁজে পেয়েছে সুচন্দ্রা। সম্ভব যদি না-হত তাহলে পরে তো অন্ধরা কোনওদিন কাউকে ভালোবাসতেই পারত না। ওই অন্ধের মতোই দীপ্রকে অনুভব করেছে সুচন্দ্রা, ওর কণ্ঠস্বরের মধ্যে। ফোনের ওপাশ থেকে দীপ্রর বলে যাওয়া শব্দের রঙেই ওর পান্না সবুজ হয়ে উঠেছে, চুনি হয়ে উঠেছে রাঙা। কীভাবে যে ওই শব্দগুলোকে নিজের শ্রুতি আর সত্তা থেকে সরায় সুচন্দ্রা।

boierpathshala.blogspot.com

পর্ব ১৪

থাকে শুধু অন্ধকার

■ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

২৬

শুধু আকর্ষণের ওপর তো কোনও সম্পর্ক টেকে না। তার জন্য চাই অনেকখানি নির্ভরতা। সেই নির্ভরতা দীপ্র বিশাখার মধ্যে খুঁজত। কিন্তু বিশাখাও কি খুঁজত দীপ্রর মধ্যে? দীপ্র ঠিক বুঝতে পারত না। কখনও ওর মনে হত যে বিশাখা এতটাই সাহসী আর স্বনির্ভর যে করেও ওপর নির্ভর করার প্রয়োজন পড়ে না ওর। আবার দীপ্র অ্যামেসে ফিরে গেলে বিশাখা যখন পাগলের মতো ফোন করে জানতে চাইত কবে আবার ডি-মোনে ফিরবে ও, তখন মনে হত বিশাখা একটা শূন্যতার মধ্যে ডুবে যাচ্ছে আর সেই শূন্যতা থেকে বাঁচানোর জন্য ওর দীপ্রকে চাই-ই চাই। সেই চাওয়ার কাছে খানিকটা অসহায় হয়ে এক-একবার রিসার্চের দফারফা করে বৃহস্পতিবার রাতেও ডি-মোনে চলে এসেছে ও। কাজে ফাঁকি দেওয়ার জন্য জবাবদিহি করতে হবে কি না সেই চিন্তা হাওয়ায় উড়িয়ে বিশাখার চুল, বিশাখার মুখ, বিশাখার নিশ্বাসের গন্ধে নিজেকে ডুবিয়ে দেবে বলে, উদগ্রীব হয়ে থেকেছে দীপ্র। কিন্তু সেদিনই অনেক রাত করে কাজ থেকে ফিরেছে বিশাখা। হাই তুলতে তুলতে জানিয়েছে, ফোরিস্টের কাজ কত কঠিন, কীভাবে খরিদ্দার বুঝে মূল্য দিতে হয়। যে কিনতে চাইছে তার পছন্দের সঙ্গে যে বিক্রি করছে তার সুবিধা মিশিয়ে দিতে হয়। বিশাখার কথা শুনে গিয়েছে দীপ্র কিন্তু কথাগুলো ওর মন অবধি পৌঁছয়নি। ওর কেবলই মনে হয়েছে মরা ফুলের গন্ধ নয় কাঁটার খোঁচা ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই কাঁটা উদাসীনতার, অবহেলার।

কিন্তু সেই বিশাখাই যখন আবার মাখরাতে ঘুম ভাঙিয়ে আদর করতে শুরু করত দীপ্রকে তখন অভিমানের দেওয়াল কীভাবে যেন গুঁড়িয়ে যেত। জাগ্রত সুনামি এসে একটা ঘুমন্ত শহরের দখল নিয়ে নিত। সুড়ঙ্গের শেষে আলোটা এত তীব্র আর এত চোখ ঝলসানো যে অন্ধকার মিলিয়ে যেত নিমেষে।

—সারা সপ্তাহ আমি তোমার জন্য কীরকম ছটফট করি, সেটা তোমাকে একটু বোঝাতে ইচ্ছে করে।

—সে কারণেই দেরি করে ফিরলে? দীপ্র জিজ্ঞেস করেছিল।

—না গো, সত্যিই কাজ ছিল। কিন্তু কাজের ভিতর প্রতিটা মুহূর্তে তোমার কথা ভেবেছি, শুধু তোমার কথাই।

—তুমি অ্যামেসে চলে আসতে পারো তো। ওখানে তো অনেকেই একসঙ্গে থাকে। কিছু না কিছু কাজ ওখানেও জুটে যাবে নিশ্চয়ই।

—আমি এখন বাড়ি ছেড়ে হোস্টেলের একটা ঘরে থাকতে যাব? তোমার কী মাথাখারাপ হয়ে গেল?

—তুমিই তো বললে যে মিস করছ...

—হ্যাঁ করছি। করি। কিন্তু তাই বলে আমি তো আবার জুলপালিকার জীবনে ফিরে যেতে পারি না। বাঘের থাকার জন্য একটা জঙ্গল চাই দীপ্র, তাকে এক-কামরার ঘরে রাখা যায় না। বিশাখা হেসে উঠেছিল।

দীপ্রর বলতে ইচ্ছে হয়েছিল যে বাঘ তো খাঁচাতেও থাকে। কিন্তু ওই এক-কামরার ঘরের উল্লেখে ও এতটাই আঘাত পেয়েছিল যে আর কথার পিঠে কথা বাড়াতে ইচ্ছে হয়নি।

অ্যামেসে ফিরে এসে লি আর টং হং'কে দেখে ভাবছিল, ওরা কী সুন্দর একটাই ঘরের মধ্যে থাকে, ওদের তো কই জায়গার অভাব হয় না। তাহলে কি যে ভালোবাসা সমস্ত খামতি মিটিয়ে দেয়, বিশাখার তা নেই ওর প্রতি? ও কেবলই একটা শূন্যস্থান পূরণের যন্ত্রমাত্র? টং হং ওকে একদিন বলেছিল যে মোমবাতির আলোয় যে স্নিগ্ধতা তা হ্যালোজেনে পাওয়া যাওয়া না। কথাটা তখনই রেজিস্টার করেনি মাথায় কিন্তু পরে ভেবেছে দীপ্র কথাটা নিয়ে। টং হং-এর ফোন থেকে একবার সুচন্দ্রাকে ফোন করেছিল ও, নিজের ফোনের চার্জ ছিল না বলে। ফোনটা ফিরিয়ে দেওয়ার সময় টং হং ওর দিকে তাকিয়ে একটু বেশিক্ষণ ধরেই হেসেছিল।

—হাসছো কেন ওভাবে? দীপ্র জানতে চেয়েছিল।

—যখন কথা বলছিলে তখন তোমার মুখে একটা অদ্ভুত শান্তি আর আনন্দ একসঙ্গে খেলা করছিল।

অ্যামেসে ফিরে এসে লি আর টং হং-কে দেখে ভাবছিল, ওরা কী সুন্দর একটাই ঘরের মধ্যে থাকে, ওদের তো কই জায়গার অভাব হয় না। তাহলে কি যে ভালোবাসা সমস্ত খামতি মিটিয়ে দেয়, বিশাখার তা নেই ওর প্রতি? ও কেবলই একটা শূন্যস্থান পূরণের যন্ত্রমাত্র? টং হং ওকে একদিন বলেছিল যে মোমবাতির আলোয় যে স্নিগ্ধতা তা হ্যালোজেনে পাওয়া যাওয়া না। কথাটা তখনই রেজিস্টার করেনি মাথায়। কিন্তু, পরে ভেবেছে দীপ্র কথাটা নিয়ে। টং হং-এর ফোন থেকে একবার সুচন্দ্রাকে ফোন করেছিল ও, নিজের ফোনের চার্জ ছিল না বলে। ফোনটা ফিরিয়ে দেওয়ার সময় টং হং ওর দিকে তাকিয়ে একটু বেশিক্ষণ ধরেই হেসেছিল। হাসছো কেন ওভাবে? দীপ্র জানতে চেয়েছিল। যখন কথা বলছিলে, তখন তোমার মুখে একটা অদ্ভুত শান্তি আর আনন্দ একসঙ্গে খেলা করছিল।

সেদিন রাতে লি আর ওর সঙ্গেই ডিনারে গিয়েছিল দীপ্র। নিজের বাড়ির কথা, বড় হয়ে ওঠার কথা বলেছিল ওদের। সুচন্দ্রার কথাও কি বলেছিল কিছু, জড়তা কাটিয়ে?

দীপ্রর ঠিক খেয়াল পড়ে না। কিন্তু টং হং আগের মতো করে আর কথা বলে না কেন ওর সঙ্গে সেটাও ভালো বুঝতে পারে না। দীপ্রর মুখে শান্তি আর আনন্দ খুঁজে পায় না বলে?

কোথায় পাওয়া যায় শান্তি আর আনন্দ?

হানিমুনে জাপানই এল ওরা। বিশাখা আসার আগে একটু হংকং যেতে চাইছিল কিন্তু দীপ্র এই একটা ব্যাপারে একটু জেদ ধরে রইল। না চাইতেও অন্ধকার জমে উঠেছিল জীবনে। প্রথম সূর্যের দেশের আলোয় তাকে দূর করে দিতে চাইছিল ও, যতটা সম্ভব।

জাপানে পৌঁছে খানিকটা অবাকই হয়ে গেল। কী শান্তির একটা দেশ অথচ একই সঙ্গে কী তীব্র তার গতি। পাশ্চাত্যের সবটুকু বিজ্ঞানকে নিজের পরম্পরার মধ্যে স্থাপন করেছে জাপান। পেশাদারিত্ব আর সেবা হাতে হাত মিলিয়ে চলতে পারছে তাই, প্রতিটা ক্ষেত্রে।

টোকিওতে দীপ্রদের হোটেলের লবিতে সকালেই চলে এলেন এক ভদ্রলোক। তিনি ওদের টোকিও শহর ঘুরিয়ে দেখাবেন। না, তার বিনিময়ে কোনও পয়সা নেবেন না। অধ্যাপক ভদ্রলোক এই কাজ করেন কারণ তিনি গর্ব অনুভব করেন নিজের শহরের দর্শনীয় জায়গাগুলো টুরিস্টদের ঘুরিয়ে দেখাতে। কথা প্রসঙ্গে নাকামুসি নামের সেই অধ্যাপক জানালেন যে তার মতো আরও অজস্র মানুষ জাপানে ছড়িয়ে আছে যারা টুরিস্টদের পাশে থাকেন। এরা সবাই টোকিও ফ্রি গাইড সার্ভিসের সঙ্গে যুক্ত।

বিশাখা নাকামুসিকে এড়িয়ে যেতে চাইছিল কিন্তু দীপ্রর ইচ্ছেতেই ভদ্রলোক ওদের সঙ্গী হলেন। টোকিওর এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত হাতের তালুর মতো চেনা যার, তেমন একটা লোক পাশে থাকলে সুবিধেই হবে, এই ছিল দীপ্রর বক্তব্য।

নাকামুসি ওদের আসাকুসা বলে একটা সব

boierpathshala.blogspot.com

পেয়েছিল দেশে নিয়ে গেলেন সেটা টোকিওর ব্যস্ততম স্ট্রিট মার্কেট। কিন্তু বাজারের হই হট্টগোল কিচ্ছু সেখানে নেই। একটা বিকিকিনির জায়গায় যে এতটা শান্তি থাকতে পারে সেটা ওখানে না-গেলে জানা হত না। সেখান থেকে বেরিয়ে নাকামুসির সঙ্গে টোকিওর পথে পথে ঘুরে শেষমেশ একটা বিরাট মন্দিরের সামনে এসে থামল ওরা। চলার পথে দারুণ অভিজ্ঞতা হল শিবুয়ার মোড়ে এসে। সেখানে অজস্র লোক একসঙ্গে রাস্তা পার করার চেষ্টা করছে কিন্তু প্রচণ্ড শৃঙ্খলার সঙ্গে। তারপর নাকামুসি ওদের নিয়ে গেলেন আকিবারা বলে একটা শপিং মলে যেখানে পৃথিবীর সমস্ত ইলেকট্রনিক গেজেট সস্তায় মেলে। কিন্তু ইলেকট্রনিক জিনিস মন টানছিল না ওদের। বরং শিংকাসেন বলে জাপানের বুলেট ট্রেনে চেপে একটা অনন্য অভিজ্ঞতা হল। ঘন্টায় তিনশোকুড়ি কিলোমিটার গতিতে চলে এই ট্রেন। কী প্রবল তার গতি আর কী অসম্ভব পরিষ্কার তার ভিতরটা।

দিন তিনেক টোকিওতে থেকে কিওটো গেল ওরা। কিওটো খুব শান্ত একটা শহর যেখানে অনেকগুলো বৌদ্ধমন্দির। তারই একটায় সোনায় মোড়া একটি বুদ্ধমূর্তির সামনে বিশাখাকে পাশে নিয়ে বসে রইল দীপ্র। ওর মনে হচ্ছিল জীবন থেকে সব নেগেটিভিটি, সমস্ত তিক্ততা মুছে যাচ্ছে। বুদ্ধের সামনে বসে চোখের সামনে থেকে কুয়াশা মুছে যাচ্ছে।

টোকিওয় ফিরে দীপ্র টের পাচ্ছিল কোথাও একটা রূপান্তর ঘটছে ওর। আর সেই রূপান্তর ওদের সম্পর্কটাকেও গড়ে নেবে নতুন ছাঁচে। সমস্ত দ্বিধা, সব সন্দেহ আর সংশয় ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে। অন্ধকারের ভিতর দিয়ে বইতে শুরু করবে একটা নদী। সেই নদীর জলের সঙ্গে যখন আকাশের বিদ্যুতের সংযোগ ঘটে তখন নদীর ভিতরে কী ঘটে? সে কি ফুটে ওঠে? কামপ্রবণ হয়ে যায় আরও? কিয়োটো থেকে টোকিয়োতে ফিরে আসার পর বিশাখাকে দেখে তেমনই লাগছিল। বাসনা নয় কেবল, বিস্তারে ধরতে চাইছিল ও দীপ্রকে। আচড়-কামড়, লালা-বীর্যের গতানুগতিকতা পার করে, শরীরী ব্যায়াম থেকে শরীরী স্ফুলিঙ্গে উত্তীর্ণ হতে হতে নদীর ভেতর থেকে বিদ্যুৎ তুলে নেওয়ার মতো করে বিশাখার ভেতর থেকে সবটুকু অতীত তুলে নেওয়ার চেষ্টা করছিল দীপ্র। সেই প্রক্রিয়া কোথাও একটা আর্মি বলে মনে হচ্ছিল ওর যে আর্মিটা শেষে দুটো ঝরনা মিশে যায় পরস্পরে, দুটো চোখ থেকে একই কান্না বেরিয়ে আসে হয়তো বা।

আবেশ আর ক্লান্তির মধ্যে আধাআধি ভাগ হয়ে গিয়ে দীপ্র বিশাখার শরীর থেকে নিজেকে সরিয়ে নিল আর চোখদুটো লেগে এল তখনই। চটকাটা ভাঙতেই দেখল বিশাখা প্রায় নগ্ন হয়েই বসে আছে ওর পাশে।

—তুমি ঘুমোবে না?

—আমার ঘুমোতে ভাল লাগে না। বিশাখা বলল।

—তাহলে কী করবে এখন?

—যা করছিলাম একটু আগে। বলেই বিশাখা একটা কাগজ দীপ্রর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, এইগুলোতে সই করো একুনি। তারপর আবার...

ওর দিকে চোখ মারা বিশাখাকে অবাক হয়ে দেখতে দেখতে দীপ্র জানতে চাইল, কীসের কাগজ এগুলো? কেন সই করতে হবে?

২৭

বিশাখার দেওয়া কাগজপত্র সই করার সময় দীপ্র ততকিছু ভাবেনি। কিন্তু আমেরিকায় ফিরে এসে ওর মনে হতে থাকল, কী এমন তাড়া যে বিশাখাকে জাপানে হানিমুনে নিয়ে গিয়ে অতবড় ইনস্যুরেন্সের কাগজে সই করাতে হল দীপ্রকে? করবে না, করবে না করে একদিন প্রশ্নটা করেও ফেলল বিশাখাকে।

— আমি জানতাম তুমি এই কথাটা জিজ্ঞেস করবে। কারণ, সংসার তো তোমায় চালাতে হয় না। বিশাখা একটা বাঁকা হাসি হেসে বলল।

— সংসার কি ইনস্যুরেন্সের টাকায় চলবে?

— তাই তো চলছে। শান্তনুর মৃত্যুর পর ইনস্যুরেন্সের থেকে ওর ডেথ বেনিফিট না পেলে পরে এই ফুটানি চলত কী করে? জাপান ঘুরে এলাম, তাতে কত ডলার খরচ হয়েছে, ভেবে দেখেছ একবারও?

— তুমিই তো হানিমুনে যেতে চাইছিলে।

— নতুন বিয়ের পর যে-কোনও স্ত্রীই চাইবে। যে কোনও বরেরও চাওয়ার কথা। তুমি চাওনি?

— আমি তা বলিনি। কিন্তু, আমি রিসার্ট ক্লার। আমার টাকাপয়সা ততকিছু নেই। এসব তো তোমার জানা কথা। তারপরও তুমি এই জাতীয় কথা কেন বল আমি জানি না।

—বলতাম না। তুমি হঠাৎ করে জেরা করতে শুরু করলে তাই...

—জেরা? আমি একটা সাধারণ প্রশ্ন করেছি তোমাকে, তোমার সেটা জেরা মনে হল?

—কেন করবে? কেন অন্ধের মতো ভরসা করতে পারো না আমার ওপর? বলতে বলতে বিশাখা এগিয়ে এল দীপ্রর দিকে। ওকে জড়িয়ে ধরে নিজেকে প্রায় ছেড়ে দিল দীপ্রর গায়ে।

কিন্তু দীপ্র তাতে একটুও জাগ্রত হল না। ওর মাথার মধ্যে তখন বিশাখার পয়সায় জাপান যাওয়ার গ্লানি দপদপ করছে।

বিশাখা ওর গালে, গলায় অজস্র চুমু খাচ্ছিল। কিন্তু দীপ্র চোখ বন্ধ করে বসেছিল। নিথর, নিস্পন্দ হয়ে। ওর বন্ধ চোখের ভেতর জাপানের সেই সোনায় মোড়া বুদ্ধমূর্তি দাউদাউ করে জ্বলছে। অপমানে।

সময় সময়ের মতো চলতেই থাকে আর চলতে চলতেই কয়েকটা জিনিসকে সে ঠিক করে দেয়। আবার কয়েকটাকে পারেও না। মা যেমন দীপ্রর সঙ্গে কথা বলবে না সেই জেদ ধরেই থাকল। কিন্তু মা-ই আবার দেয়ালিকে বাধা দিল না দীপ্রর সঙ্গে কথা বলতে। দেয়ালির মাধ্যমেই দীপ্রর খবর পেল মা। আর নিজেদের খবরও দিত যখন যেমন চাইত। আমেরিকা থেকে মায়ের জন্য ক্যালসিয়ামের ওষুধ পাঠাল দীপ্র। দেয়ালি জানাল যে সেই ওষুধের বাক্সটা হাতে নিয়ে কাঁদছিল মা।

— খায়নি? দীপ্র টানাপোড়েনে ছিঁড়ে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করল।

— খাবে। নিশ্চয়ই খাবে। কিন্তু আরও সময় লাগবে।

দেয়ালির কথা শুনতে শুনতে দীপ্র ভাবছিল, এমন কোনও ওষুধ পাওয়া যায় না, যা পলাকে পৃথিবীর সব ভুল বোঝাবুঝির অসুখকে সারিয়ে দিতে পারে?

...

টিফানথ্যালারের নির্দেশ অনুযায়ী বার্কলের সেমিনারটায় যেতেই হল দীপ্রকে। এমন না যে ওর খুব একটা আপত্তি ছিল। কিন্তু একটা উইকেন্ড বিশাখার কাছে যেতে পারবে না বলে ভাবছিল। মাসখানেক আগে এরকমই একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল যখন, তখন বিশাখাকে ফোন করে হাউমাউ করেছিল দীপ্র। বিশাখা খুব সহজ গলায় বলেছিল যে কাজ থাকলে পরে তো যেতেই হবে। কথাটা ভালো লাগেনি দীপ্রর। এবারে তাই সানফ্রানসিসকো যাওয়ার কথা ও জানালোই না বিশাখাকে। কী লাভ জানিয়ে? বিশাখা তো সেই একই উত্তর দেবে।

—মানুষ কেমন জানেন তো? সোনার মোহোর হাতে পেয়ে গেলে পর তার মনে হয় মোহরটা বোধহয় সোনার নয় তামার। সুচন্দ্রা ওকে একদিন ফোনে বলেছিল।

সেদিন কথাটার মানে বুঝতে পারেনি দীপ্র। আজ মনে হচ্ছিল, বিশাখা ওকে তামা দিয়ে তৈরি ভাবতে শুরু করে দেয়নি তো? কিন্তু দীপ্র কি আদৌ সোনা ছিল কখনও?

সৌন্দর্যে নিজেই যদি একটা শহর হয়ে ওঠে তাহলে তার নাম হবে সানফ্রানসিসকো। সেখানে একইসঙ্গে পাহাড় আর সমুদ্র আর মায়াবী সমস্ত রাস্তা। গাড়ি এক দিক দিয়ে পাহাড়ের ওপর উঠে যায়, অন্য দিক দিয়ে পাহাড় থেকে নেমে আসে নীচে। রাস্তায় রাস্তায় গান হয়। গিটার বাজিয়ে কত মানুষ যে গায়। ইতিউতি উঁয়ে যায় অজস্র পায়রা। ফিশারম্যানস ওয়ার্ফ বলে একটা জায়গা প্রশান্ত মহাসাগর লাগোয়া। সেখানে নানান রকমের মাছ বিক্রি হয়। মূলত চিনে রাঁধুনিরাই সেই মাছগুলো রেঁধে বা ভেজে দেয় আর সারা পৃথিবীর টুরিস্টরা খায়। দীপ্র দেখছিল আর ভাবছিল ওই সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে, পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে, সানফ্রানসিসকো কীরকম প্রকৃতির সঙ্গে বেঁধে ফেলছে মানুষকে।

দীপ্রর ভীষণ ভালো লাগছিল। জাপানে শান্তি পেয়েছিল আর এখানে যেন রূপে পাগল হয়ে উঠছিল। সকালে-রাতে যখনই সময় পেত সানফ্রানসিসকোর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াত আর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে শহরটার রূপ টেনে নিত ভিতরে।

সানফ্রানসিসকো থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরেই নাপা বলে একটা ছোট শহর আছে। ওয়াইনারির জন্য বিখ্যাত জায়গাটা। দীপ্রর সঙ্গেই সেমিনারে আসা রিচার্ড খুব করে ধরল একসঙ্গে একটু নাপায় বেড়াতে যাবে। ছোট ছোট কুটিরের মতো অনেক বাড়ি, বাড়িগুলোর পেছনেই মদ তৈরি হয়। রাত্রি আটটায় রওনা দিয়ে ন'টা নাগাদ নাপায় পৌঁছে গেল দীপ্ররা। ওখানে হোটেলগুলো সব ওপেন এয়ার, লনে বসে মদ খাচ্ছে লোকেরা নানান সুখাদ্যের সঙ্গে। দুটো লন পেরিয়ে তিননম্বর লনে ঢুকল দীপ্ররা। রিচার্ডের কথামতো একটা মদ অর্ডার করে দীপ্র ভাবছিল, সারাদিনে বিশাখা একবারও ফোন করল না কেন, গতকাল ডি-ময়েনে না যাওয়া সত্ত্বেও। আর তখনই সামনের টেবিলে বিশাখাকে দেখতে পেল দীপ্র।

বিশাখাই তো? নাকি মদে চুমুক না দিয়ে ও ভুল দেখছে? দীপ্রর মনে হল, একটা রাসায়নিক বিস্ফোরণ হচ্ছে সামনের টেবিলটায়। ও আরও পরিষ্কারভাবে দেখবে বলে উঠে দাঁড়াল।

(চলবে)

সানফ্রানসিসকো থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরেই নাপা বলে একটা ছোট শহর আছে। ওয়াইনারির জন্য বিখ্যাত জায়গাটা। দীপ্রর সঙ্গেই সেমিনারে আসা রিচার্ড খুব করে ধরল একসঙ্গে একটু নাপায় বেড়াতে যাবে। ছোট ছোট কুটিরের মতো অনেক বাড়ি, বাড়িগুলোর পেছনেই মদ তৈরি হয়। রাত্রি আটটায় রওনা দিয়ে ন'টা নাগাদ নাপায় পৌঁছে গেল দীপ্ররা। ওখানে হোটেলগুলো সব ওপেন এয়ার, লনে বসে মদ খাচ্ছে লোকেরা নানান সুখাদ্যের সঙ্গে। দুটো লন পেরিয়ে তিননম্বর লনে ঢুকল দীপ্ররা। রিচার্ডের কথামতো একটা মদ অর্ডার করে দীপ্র ভাবছিল, সারাদিনে বিশাখা একবারও ফোন করল না কেন, গতকাল ডি-ময়েনে না যাওয়া সত্ত্বেও। আর তখনই সামনের টেবিলে বিশাখাকে দেখতে পেল দীপ্র।

boierpathshala.blogspot.com

PAGE 4,5_9x_PAGE 4,5.qxd 9/22/2017 7:58 PM Page 1

পর্ব ১৫

থাকে শুধু অন্ধকার

■ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

দীপ্র কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল ছেলেটার দিকে। আজ যদি ও না থাকত তাহলে ওই বিউইতেই মরে পড়ে থাকত হত দীপ্রকে। কিন্তু ওকে বাঁচাতে গিয়ে নিজেও বেশ কয়েক ঘা খেয়েছে রিচার্ড, অথচ দীপ্রকে ও খুব অল্পদিনই চেনে। ডানদিকের একটা দাঁত খুলে পড়ে গিয়েছিল দীপ্রর। তুলো চেপে সেখানকার রক্ত আটকানোর চেষ্টা করতে করতে ও বলল, চড়াও না-হয়ে কী করতাম? ওরা তো আমার বউকে নিয়ে নোংরা ভিডিও চালাচ্ছিল। রিচার্ড একটা পেইনকিলার দীপ্রর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, বাচ্চাদের মতো কথা বলছ তুমি। তোমার বউয়ের নাচের ভিডিও ওদের কাছে এলো কী করে?

এই লোকটাকেই তো শান্তনুদার অনুপস্থিতিতে ওর বাড়িতে দেখেছিল দীপ্র। বিশাখাকে চুমু খাচ্ছিল লোকটা, নাকি বিশাখাই ওকে? আর এখন নিজের ল্যাপটপে পাশে বসা দুই বন্ধুকে বিশাখার নাচ দেখাচ্ছে। সেই লোকের ধারে বিকিনি পরা বিশাখাকে দেখে মুখই হয়েছিল দীপ্র। কিন্তু এই নাচের ভিডিওতে মিনিস্কার্ট পরা বিশাখাকে দেখেই মাথায় রক্ত চড়ে গেল ওর। কেনই বা যাবে না? প্রথম ঘটনাটার সময় বিশাখা তো ওর স্ত্রী ছিল না।

—হাউ ডেয়ার ইউ প্রে দিজ থিংস শাবলিকলি? ইউ সোয়াইন। প্রায় একটা লাফ মেরে লোকটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল দীপ্র।

—ধ না ছেলে আর ইউ টু কনফ্রন্ট মি? লোকটা সজোরে ঘাড়ে মারল দীপ্রর গালে, দীপ্র ল্যাপটপটার দিকে হাত বাড়াতেই।

ঘাড়টা সোজা মাটিতে পড়ে গেল দীপ্র। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠল, স্টপ দেয়ার দিস ভার্ট ভিডিও। অমারওয়াইজ আই উইল কল নাইন-ওয়ান-ওয়ান।

—কিন্তু কেন থামাব? তুমি কে আমাদের অর্ডার করার? লোকটার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একজন বলে উঠল।

—কারণ এটাতে আমার বউকে দেখা যাচ্ছে। আর আমার বউয়ের সম্মানহানি করার জন্য আমি তোমাদের অ্যারেস্ট করাব পুলিশ দিয়ে।

কথাটা শেষ হওয়ার আগেই দুটো লোক মিলে মারতে শুরু করল দীপ্রকে। দীপ্রর ব্যায়াম করা চেহারা, কিন্তু তাই বলে দুটো সাহেবের বেপরোক্ত মার সহ্য করার শক্তি ওর ছিল না। রিচার্ড এসে ওকে ওদের হাত থেকে না-ছাড়ালে হয়তো মরেই যেত ও মার খেয়ে।

আশ্চর্যের বিষয় যে ওই হোটেল কাম বারের মালিক অথবা অন্য কেউ এসে হাত লাগাল না রিচার্ডের সঙ্গে দীপ্রকে অমন নির্দয়ভাবে মার খেতে দেখেও।

—এখানকার লোকেরা অমনই। আমেরিকার ওয়েস্ট কোস্টের লোক এমনিতেই ঝামেলাতে জড়াতে চায় না। তার উপর আবার তুমি নিজেই গিয়ে ওদের ওপর চড়াও হয়েছিলে, সেটা ওখানে বসে মদ খাওয়া অনেকেই খেয়াল করেছে। ঘণ্টাদু'য়েক পরে রিচার্ড ওর বিছানার পাশে বসে ওকে বলল।

দীপ্র কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল ছেলেটার দিকে। আজ যদি ও না থাকত তাহলে ওই বিউইতেই মরে পড়ে থাকত হত দীপ্রকে। কিন্তু ওকে বাঁচাতে গিয়ে নিজেও বেশ কয়েক ঘা খেয়েছে রিচার্ড, অথচ দীপ্রকে ও খুব অল্পদিনই চেনে।

ডানদিকের একটা দাঁত খুলে পড়ে গিয়েছিল দীপ্রর। তুলো চেপে সেখানকার রক্ত আটকানোর চেষ্টা করতে করতে ও বলল, চড়াও না-হয়ে কী করতাম? ওরা তো আমার বউকে নিয়ে নোংরা ভিডিও চালাচ্ছিল। রিচার্ড একটা পেইনকিলার দীপ্রর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, বাচ্চাদের মতো কথা বলছ তুমি। তোমার বউয়ের নাচের ভিডিও ওদের কাছে এলো কী করে?

—আমি জানি না। আমাকে ওকে জিজ্ঞেস করতে হবে। দীপ্র কিছুতেই রিচার্ডকে বলতে পারল না যে এই লোকটাকে ও ঢি-মহলী অবস্থায় দেখেছে বিশাখার সঙ্গে।

—সেটা আগে জিজ্ঞেস করে নিয়ে তারপর তোমার ওদের দিকে তেড়ে যাওয়া উচিত ছিল। মোবাইল ফোন তো কাছেই ছিল তোমার। তুমি কেন কল করলে না তোমার ওয়াইফকে?

—মাথায় আসেনি, বিশ্বাস করো আমার মাথায় আসেনি। বলতে বলতে যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠল দীপ্র। রিচার্ড সেটাকে শুধু শরীরের ভেবে আবারও আইসব্যাগ চেপে ধরল দীপ্রর ঘাড়ে, গলায়। বুঝতে পারল না যে সেই যন্ত্রণা ছাপিয়ে দীপ্রর মন চিৎকার করে উঠছে নীরবে, এইরকম একটা ভিডিও এগজিস্ট করে সেটা বিশাখা কেন বলল না ওকে? কেন?

২৮

রিচার্ড ফিরে যাওয়ার পরেও সানফ্রানসিসকোতে থেকে গেল দীপ্র কারণ বিশাখা আসছে। ফোনে টিফানিখালাদের কাছ থেকে দিনতিনেক ছুটি চেয়ে নিল পারিবারিক কাজের অজুহাত দিয়ে। টিফানিখালার ওর সেমিনারে পেপার প্রেজেন্টেশন ভালো হয়েছে সেই খবর পেয়ে খুশি ছিল বলে আর আপত্তি করল না।

থাকবে যে এমনটা ও ভাবেনি প্রথমটা। কিন্তু, বিশাখাকে ফোন করতেই বিশাখা একটা-দুটো কথার পর বার্স্ট করে উঠল, তুমি আমাকে সন্দেহ করো, প্রতিটা মুহূর্তে সন্দেহ করো।

—এখানে সন্দেহের প্রশ্ন উঠেছে কোথায়? আমি তো পরিষ্কার দেখলাম তুমি নাচছ, আর লোকটা সেই ভিডিও দেখাচ্ছে...

—ভুল দেখেছ তুমি। ম্যাকবেথ যেমন ডানকানের ভূত দেখত সর্বত্র সেইরকম ভূত দেখেছ আমার। আর কেন দেখেছ জানো? তুমি মনে মনে খারাপ কথা ভাবো আমার সম্পর্কে, তাই দেখেছ।

—বেশ, আমি অত সাহিত্য পড়িনি তাই সাহিত্যের রোগাতেশে কিছু ভাবিও না। অত ভারী কথা আমায় শোনাচ্ছ কেন? আমি স্পষ্ট দেখলাম যে...

—কী দেখলে? আমি নাচছি? বেশ, কারও সঙ্গে শুয়ে আছি সেটা তো দেখনি? তাহলে অত রিয়্যাক্ট করার কী ছিল?

—কিন্তু ওই লোকটা যাকে আমি শান্তনুদা থাকাকালীন তোমার সঙ্গে তোমার বাড়িতে দেখে ছিলাম, তাকেই আবার দেখলাম...

—ভুল বলছ। প্যাট্রিক এখন ফ্রাঙ্কফুর্টে। ওকে তুমি সানফ্রানসিসকোয় দেখতেই পারো না।

—ঠিক সানফ্রানসিসকো নয়, তার থেকে সামান্য দূরে নাপা বলে একটা জায়গায়।

—ওসব নাপা-ফাপার নাম জানি না। জীবনে কখনও শুনিনি। চার-পাঁচ বছর আগে একবার এনএফও-তে গিয়েছিলাম আমরা। তখন গোল্ডেন গেট দেখে ফিরে এসেছিলাম।

—কিন্তু এখন তো নাপা মোটামুটি একটা টুরিস্ট ডেস্টিনেশন, বাড়িতে বাড়িতে ওয়াইনারি। কত লোক যায় সেখানে।

—আর সেখানেই তুমি প্যাট্রিককে দেখতে পেয়ে গেলে? সে আবার এসে মারল তোমাকে?

—আমি লোকটার নাম মুখস্থ করে রাখিনি বিশাখা। আর ও তোমার নাচের ভিডিও...

—স্টপ দিস ননসেন্স। আমি জেনিফার লোপেজ কিংবা ম্যাডোনা নই যে লোকে আমার নাচের ভিডিও ভুলে দেখবে। হ্যালুসিনেশন হচ্ছে তোমার।

—না, আমার কোনও হ্যালুসিনেশন হয়নি। আমার একটা দাঁত পড়ে গেছে ওই শুয়োরটার মার খেয়ে।

—দেখো বাবা, ফোকলা হয়ে যাওনি তো। ফোকলা বর নিয়ে জীবন কাটানো খুব মুশকিল কিন্তু। বিশাখা হো হো করে হেসে উঠল ফোনের ওপাশে।

দীপ্রর ভিতরটা পুড়ে যেতে থাকল ওই হাসির আগুনে।

বিশাখা হঠাৎ হাসি থামিয়ে বলল, রিলেট ভালোবাসা ভুলের বাজার নয়। তুমি ফোনে বা মেইলে জানিয়ে দাও

boierpathshala.blogspot.com

PAGE 4,5_0x_PAGE 4,5.qxd 9/22/2017 7:58 PM Page 2

যে তুমি কয়েকদিন এসএফওতে থেকে যাবে। আমি কাল বা পরশুই আসছি।

—কিন্তু কেন? দীপ্র খানিকটা অবাকই হল।

—দু'জন মিলে স্যাট্রিককে খুঁজব সানফ্রানসিসকোর রাস্তায় রাস্তায়। পেলে পরে তো মেরেই ফেলব ওকে, যদিও আমি নিশ্চিত যে ওকে ওখানে পাওয়া যাবে না। কারণ ও ওখানে নেই।

—তাহলে আসবে কেন? কষ্ট করে?

—আসব কারণ তোমার মাথার মধ্যে যে অসুখটা দানা বেঁধেছে সেটাকে তো খুঁজে পাওয়া যাবে। আর সেই অসুখটাকে মেরে ফেলাটাও কম জরুরি নয়।

—আমার কোনও অসুখ করেনি বিশখা। আর আমি কোনও ভৌতিক দৃশ্যও দেখিনি।

—সেটা তো তুমি বলছ। তোমাকে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে গেলে হয়তো...

—কেন নিয়ে যাবে আমাকে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে? আমি কি পাগল?

—পাগল কেন হবে? কিন্তু তোমার মনে আমাকে নিয়ে...

—না, সন্দেহ নেই। কিন্তু সন্দেহ না থাকলেই যা দেখেছি তা তো অস্বীকার করতে পারি না। এই লোকটাকে তুমি আদর করেছিলে একদিন ডি-ম্যেরেন সেটা তো আমি নিজের চোখে দেখেছি। এবার বলো, যে সেটাও হ্যালুসিনেশন?

—হ্যালুসিনেশন নয় কিন্তু আদরও নয়। আমেরিকায় ওটা খুব জেনারেল কার্টেসি। তুমি নতুন তখনও দেশটায় তাই বুঝতে পারনি। অবশ্য এখনও পারো কি না বুঝতে, আমার ডাউট আছে।

দীপ্র চিৎকার করে উঠতে গেল, বুঝতে চাইও না বলে। কিন্তু নিজেকে নিজে সামলে নিয়ে বলল, আর ওই নাচের ভিডিওটাও কি কার্টেসি?

—ওরকম কোনও ভিডিওর অস্তিত্বই নেই। তুমি ভুল দেখেছ। আমি হ্যাজুয়ে পাসেন্ট শিওর।

—না, আমি ঠিকই দেখেছি।

—ঠিক আছে, আমি সানফ্রানসিসকোয় যাই। গেলেই প্রমাণ হয়ে যাবে কোনটা ঠিক আর ভুল কোনটা। বিশাখা ফোনটা কেটে দিল।

২৯

বিয়ের দিন সকাল থেকেই বুকটা মুচড়ে ব্যথা করছিল সুচন্দ্রার। বয়সে ওর থেকে বারো বছরেরও বেশি বড় একটা বিলাট্টিক লোককে ও বিয়ে করছে বলে ওর বাড়ির মত ছিল না বিয়েটায়। মা তো শেষ বাপ অবধি বাধা দিয়ে দিয়েছে। আত্মীয়স্বজনরা টিটকিরি দিচ্ছে কেউ কেউ সেই খবরও কানে এসে পৌঁছেছে ওর। কিন্তু সুচন্দ্রা কিছুকে পাত্তা দেয়নি। যে আমেরিকা ওকে নিয়ে গেল না দীপ্র, সেই আমেরিকাতেই ও যাবে, এই এক লক্ষ্য থেকে নিজেকে সংকল্পে স্থির থেকেছে।

—আমার বাবা-মা'কে কিন্তু আমি আমেরিকায় নিয়ে যাব। একুণি নয়, তবে সুযোগ-সুবিধে মতো। একটা কফি-শপে নিজের হবু বরের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে বলেছিল সুচন্দ্রা।

জয়ব্রত মিত্রর বোধহয় ভাল লেগে গিয়েছিল সুচন্দ্রাকে। তাছাড়া উনি এমন একটা মেয়ে খুঁজছিলেন যে হাসিমুখে ওনার আগের পক্ষের বাচ্চা মেয়েটাকে মায়ের যত্নেই বড় করে তুলবে। সুচন্দ্রার তাই নিয়ে কোনও আপত্তি না-থাকাটা জয়ব্রতকে শান্তি দিয়েছিল অনেকটা।

—শুধু এই বাজার ব্যাপারটা এখনই বাড়িতে জানাবেন না আপনি। তাহলে হয়তো...

—বাড়ির লোক ভীষণভাবে বেঁকে বসবে নাকি? জয়ব্রত হেসে উঠল। তারপর গলা পালটে জিজ্ঞেস করল, আপনি কম্প্রোমাইজ করছেন না তো? সেক্ষেত্রে কিন্তু আমি বারণ করব আপনাকে এগোতে।

—আপনার কি আমাকে পছন্দ হয়নি?

—অবশ্যই হয়েছে। আর তাই তো জানতে চাইছে, আপনিও আমায় পছন্দ হয়েছে বলেই এগোতে চাইলেন তো সম্পর্কটায়?

সুচন্দ্রা উত্তর না দিয়ে চোখ নামিয়ে নিল। কী করবে? দীপ্রর চেহারাটা ভেসে উঠেছিল যে চোখে। যাকে কোনওদিন দেখেনি সেই সবটা ছেয়ে আছে। তার তুলনায় এই চল্লিশ পেরোনো, টাক পড়ে যাওয়া লোকটা কে? হ্যাঁ, কম্প্রোমাইজ করছে সুচন্দ্রা। নিজের

মন্টু গুন্ডা সিঁদুর দিচ্ছে মেয়েটার মাথায়, সেই ছবিটা নিজের ক্যামেরায় ধরে রেখেছিল কানাই। পরে মন্টুর শাসানিতে ছবিটা লুকিয়ে ফেললেও নিজের মনে একটা প্রচ্ছন্ন গর্ব ছিল ওর, এই ছবিটাকে নিয়ে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দাগ লেগেছে ছবিটাতে, ছোপ ধরেছে, তবু নিজের কাছছাড়া করেনি ও জিনিসটাকে। কিন্তু আজ যখন তার জন্য পাঁচ হাজার টাকা দিতে চাইছে মেয়েটা তখন ও আর ছবিটা আটকে রাখার কারণ খুঁজে পেল না। বহুদিন একটু বিলিতি জিনিস পেটে পড়েনি।

ইচ্ছায় করছে। ভিতরটা ভেঙে খেলে, বাইরেটাও ভেঙে দিতে ইচ্ছে হয় বলেও আপোষ করছে।

—চুপ করে থাকবেন না। আপনার কথার ওপর সবকিছু ডিপেন্ড করছে...

—আমি রাজি বলেই তো দেখা করতে এসেছি। সুচন্দ্রার গলার আওয়াজ ওর নিজের কান অবধিই পৌঁছয়নি।

—তাহলে কিন্তু দিনসাতেকের মধ্যেই বিয়েটা সেরে নিতে হবে। মাঝিমাঝি সময়। আমার হাতে একদম ছুটি নেই। আর আমি আপনাকে নিয়েই আমেরিকায় ফিরতে চেষ্টা করব।

—কিন্তু এত তাড়াতাড়ি আমার ভিসা ইত্যাদি...

—ওগুলো আমার উপরে ছাড়ুন না...

নিজের অজ্ঞাতসারে ছেড়ে যে বেরিয়ে আসে তার কিছু ছাড়তেই অসুবিধে হয় না আর। সুচন্দ্রারও হয়নি। কিন্তু যখন ও দীপ্রর পাশে দাঁড়ানো মেয়েটাকে চিনে গিয়েছিল তখন সেই কথাটা দীপ্রকে না জানানো অন্যায় হত। তবু জানানোর আগে আবার একবার ভালো করে সব খোঁজ নিয়েছিল সুচন্দ্রা। এমনকী রামকালীতলা চলে গিয়েছিল একদিন। অনেক ফ্লাট হয়ে জায়গাটা চেনার জো নেই আর। তবু পুরনো বাসিন্দাদের অনেকেরই মনে আছে ঘটনাটা। বিজয়া দশমীর দিন অত সুন্দর একটা মেয়ের মাথায় কোনও লুম্পেন যদি সিঁদুর দিয়ে দেয়, কেউ না চট করে ভুলতে পারে?

সেই মন্টু গুন্ডা তো খুন হয়ে গিয়েছে, কিন্তু মেয়েটা কোথায়? ওদের পরিবারই বা কই? বাবা মারা গেছেন কিন্তু মা আর দিদি? নেই, কোনও খোঁজ নেই। পরম্পরাবিরোধী নানা কথা নানাদিক থেকে ভেসে আসতে শুনল সুচন্দ্রা। কিন্তু সেতেলোর কোনও গুরুত্ব নেই। ফিরে আসার আগে একজনের রেফারেন্সে কানাই নামের সেই ফোটোগ্রাফারের কাছ থেকে পেয়ে গেল অমূল্য জিনিসটা। মন্টু গুন্ডা সিঁদুর দিচ্ছে মেয়েটার মাথায়, সেই ছবিটা নিজের ক্যামেরায় ধরে রেখেছিল কানাই। পরে মন্টুর শাসানিতে ছবিটা লুকিয়ে ফেললেও নিজের মনে একটা প্রচ্ছন্ন গর্ব ছিল ওর, এই ছবিটাকে নিয়ে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দাগ লেগেছে ছবিটাতে, ছোপ ধরেছে তবু নিজের কাছছাড়া করেনি ও জিনিসটাকে। কিন্তু আজ যখন তার জন্য পাঁচ হাজার টাকা দিতে চাইছে মেয়েটা তখন ও আর ছবিটা আটকে রাখার কারণ খুঁজে পেল না। বহুদিন একটু বিলিতি জিনিস পেটে পড়েনি। এই ছবিটার কল্যাণে যদি... ইস যদি বিলেতে জন্মাত তাহলে রানি ভিক্টোরিয়ার ছবি তুলত কানাই। সবই কপাল...

ছবিটা আনে করে দীপ্রকে মেল করল সুচন্দ্রা। আর তার সঙ্গে লিখল যা লেখার। ওই মেলেই। তিন-চারদিনেও কোনও উত্তর না-পেয়ে ফেসবুকে মেসেজ করল সবটা। নিজের ফেক সার্টিফিকেট তো সুচন্দ্রা নিজের হাতেই সই করেছে কিন্তু দীপ্রকে তো বাঁচাতে হবে। আশ্চর্য যে নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য যে দায়ী তাকে শাস্তি দিতে একটুও মন করছিল না সুচন্দ্রার। ও শুধু ভাবছিল, দীপ্র কেন এখনও পড়ছে না, এখনও দেখছে না ওর পাঠানো মেসেজ?

বিয়ের দিন সকালে সেই কথা ভেবেই বুকে ব্যথা করছিল সুচন্দ্রার। কিন্তু দুপুরের দিকে পাঁচ মিনিটের জন্য নেট-অন করে ও দেখল ওর মেসেজের নীচে 'সিন' দেখাচ্ছে। দেখেছে, দীপ্র দেখেছে। এবার ও নিশ্চয়ই নিজেকে বাঁচানোর রাস্তা নেবে। আর নেওয়ার সময় ওর সুচন্দ্রার কথা মনে পড়বে বোধ।

থাকলই না হয় দীপ্রর থেকে দূরে। কিন্তু দূরে থাকলেও বুঝি কাছে থাকা যায় না?

ভাবতেই চোখ ফেটে জল এল সুচন্দ্রার। কিন্তু একইসঙ্গে বুকের ব্যথাটা কমে গেল। ওর অশ্বাসটা শান্তির নিশ্বাস হয়ে মিশে গেল পৃথিবীতে। সুচন্দ্রা মোবাইল বন্ধ করার আগে দীপ্রর ছবিতে ঠোঁট ছোঁয়াল একবার।

৩০

যেদিন সানফ্রানসিসকো এসে পৌঁছল সেদিন বিকেলেই দীপ্রকে নিয়ে ঘুরতে বেরোল বিশখা। আর অসম্ভব মনমরা হয়ে থাকা দীপ্রকে একরকম জোর করেই ট্রামে তুলল। সানফ্রানসিসকোর ট্রামগুলো খুব অভিনব। গুলের খোঁটাটাই কাঠের তৈরি। আঁকাবাঁকা পাহাড়ি রাস্তা ধরে ওরা কখনও উঁচুতে ওঠে, কখনও বা নীচে নামে। সেই যাত্রাপথে পাদানিতে দাঁড়িয়েও অনেকে ঝোলে। এমনই একটা দেশ এটা যে কন্ডাক্টর যখন বলে 'পাদানিতে দাঁড়ানোর জন্য আর দুটো জায়গা খালি আছে মাত্র', দুইয়ের বদলে চারজন উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু দীপ্রর উঠে দাঁড়ানোর কোনও ইচ্ছে ছিল না। ও শুধু ভাবছিল যে এই শহরটায় পা রাখার পরদিনই ও প্রশান্ত মহাসাগরের বেশ খানিকটা ভিতরে ঢুকে গিয়েছিল হাঁটতে হাঁটতে। একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে আর একটা পাথর ধরেই সামলে নিয়েছিল। তারপর একটা পাথরে বসে অন্য একটা পাথরে বসে লিখেছিল বিশখার নাম। সেই নামটাই যে এতবড় ভার হয়ে উঠবে, ও কি ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করেছিল সেই মুহূর্তে।

বিশখা হাত ধরে টেনে তুলল দীপ্রকে, বুড়োদের মতো বসে আছে শুধু। পাদানিতে গিয়ে দাঁড়াই চলো, সমুদ্রের মিষ্টি হাওয়া আমাদের ছুঁয়ে এপার থেকে ওপারে চলে যাবে।

দীপ্র বলতে পারল না যে ওর জীবনের সব হাওয়াই তো লোনা হয়ে গিয়েছে। আবার কোন জাদুবলে তা মিষ্টি হবে?

—সানফ্রানসিসকোর মিউজিয়ামটা আমায় দেখতে নিয়ে গেলে না, এত করে বললাম। বিশখা বলে উঠল।

—যাওয়া যাবে কখনও সময় পেলে। দীপ্র জবাব দিল।

—সময় কি ওরকম মুঠো মুঠো পড়ে থাকে? সময় বয়ে যায় আর তার ভিতরেই যে কাজগুলো করার সেগুলো করে নিতে হয়। বলতে বলতে বিশখা হাত ধরে পাদানিতে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাল দীপ্রকে।

দীপ্র বাইরে তাকিয়ে দেখল, মেঘ করে আসছে আর এসএফওর অগণিত পায়রা উড়ছে হাওয়ায়। ওরা বোধহয় আগেভাগেই বৃষ্টির খবর পায়। ইশ মানুষও যদি ওদের মতোই একটু আগেভাগে খবর পেত, কখন রোদ ঝলমলবে আর বৃষ্টি নামবে কখন?

পরের স্টপেজেই তিন-চারটে লোক উঠল ট্রামে আর দীপ্র দেখল কজন তাদের সবার হাতেই একটা করে বাদ্যযন্ত্র। একজন গিটার বাজাচ্ছে, একজনের ঠোঁটে বাঁশি আর একটা লোক মাউথ-অর্গান বাজাচ্ছে। ভিতরে অনেক ফাঁকা সিট থাকা সত্ত্বেও ওরা পাদানিতেই দাঁড়িয়ে বাজাতে শুরু করল। সানফ্রানসিসকোতে ব্যাপারটা খুব একটা অবাক করা নয় বলে তত কিছু পাত্তা দিল না দীপ্র। কিন্তু পরের স্টপ আসতেই ও দেখল যে ওকে আর বিশখাকে প্রায় ঘিরে ফেলেছে লোক তিনটে। একটু সরে দাঁড়াতে গেল দীপ্র। আর তখনই লোকটাকে ট্রামে উঠতে দেখল।

ভয়ে গলা শুকিয়ে গেল দীপ্রর। ও বিশখার দিকে তাকাল।

বিশখা ওর চোখের থেকে চোখ সরিয়ে লোকটাকে ইংরাজিতে বলল, আগেভাগে স্টেজে উঠলে না কেন?

(পরের পর্বে সমাপ্য)

boierpathshala.blogspot.com

PAGE 4,5_9x_PAGE 4,5.qxd 10/6/2017 10:15 PM Page 1

শেষ পর্ব

থাকে শুধু অন্ধকার

■ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

মন্টুকে খুন করার ছ'দিনের মাথায় কলকাতার গোপন ঠিকানায় ফটিক গ্রেপ্তার হয়ে যায়। আর জেলে বসে ও জানতে পারে না যে মধুরাই ইন্সপেক্টর সরকারকে জানিয়ে এসেছিল ফটিক ওকে থ্রেট দিচ্ছে মৌলালির গোপন ডেরা থেকে। ইন্সপেক্টর সরকার জানতেন যে, থ্রেট দেওয়ার সময়ে কেউ নিজের গোপন ঠিকানা বলে দেয় না। কিন্তু ততক্ষণে মধুরার চেহারা ওর ভেতর চরকির মতো ঘুরতে শুরু করে দিয়েছে। ইন্সপেক্টর সরকারের সাহায্যেই মধুরা নিজেকে বিশাখা করে ফেলে। নাম-পদবি পালটে একটা নতুন অস্তিত্বের ভীষণ দরকার ছিল যে! কলকাতায় ভাড়ার ফ্ল্যাটটাও ইন্সপেক্টর সরকারেরই দেখে দেওয়া। ইন্সপেক্টর সরকার শুধু দেখতে পাননি পেছনের সেই গাড়িটাকে। গোয়া থেকে মুম্বই ফেরার রাস্তায় মাইনাস করার জন্য রাস্তায় নামতেই যেটা প্রচণ্ড জোরে পেছন থেকে ধাক্কা মারবে ওনাকে। গাড়ির ড্রাইভার শান্তনুর সঙ্গে গোয়াতেই আলাপ হয়েছিল বিশাখার।

মন্টু গুপ্তা যখন ওর হাত দুটো চেপে ধরে ওর মাথায় সিঁদুর দিয়ে দিচ্ছিল তখন মধুরার মনে হচ্ছিল যে শেষ হয়ে গেল সবকিছু। সেই ঘটনার পর যখন টিকিরি শুনতে হত ঘরে বাইরে তখনও মনে হত সব শেষ। এমনকী মন্টুর কল্যাণে যখন একটু দম নেওয়ার অবোধ হল জীবনে তখনও কালো ছাড়া কোনও আলো দেখতে পায়নি মধুরা। মন্টু তো ওর গন্তব্য নয়, মন্টুকে তো ও চায়নি কোনওদিন। তাই মন্টুর রাইভাল গ্যাং-এর ফটিক ওরা প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছে জেনে ভয় নয় খ নিকটা ভরসাই পেয়েছিল মধুরা। সিনেমা দেখে বেরোনোর সময় ফটিককে দেখে থাড়িয়ে পড়েছিল। নিজেকে সামলাতে না-পারা ফটিক যখন ওর কাছে এসে মধুরার বুকটা ছুঁয়ে যায় মধুরা ভয় চোখে চোখ রেখে বলেছিল, এটুকুতেই খুশি? আরও বেশি পেতে ইচ্ছে করে না? আরও বেশির লোভে পাগলপারা ফটিক দশদিনের ভেতরে গুলি করে দেয় মন্টুকে। (মধুরার সাথে দেখা করে মন্টু কখন গলির মুখে বেরোবে সে কথাই মধুরাই জানিয়ে দিয়েছিল।)

মন্টুকে খুন করার ছ'দিনের মাথায় কলকাতার গোপন ঠিকানায় ফটিক গ্রেপ্তার হয়ে যায়। আর জেলে বসে ও জানতে পারে না যে মধুরাই ইন্সপেক্টর সরকারকে জানিয়ে এসেছিল ফটিক ওকে থ্রেট দিচ্ছে মৌলালির গোপন ডেরা থেকে। ইন্সপেক্টর সরকার জানতেন যে, থ্রেট দেওয়ার সময়ে কেউ নিজের গোপন ঠিকানা বলে দেয় না। কিন্তু ততক্ষণে মধুরার চেহারা ওর ভেতর চরকির মতো ঘুরতে শুরু করে দিয়েছে। ইন্সপেক্টর সরকারের সাহায্যেই মধুরা নিজেকে বিশাখা করে ফেলে। নাম-পদবি পালটে একটা নতুন অস্তিত্বের ভীষণ দরকার ছিল যে! কলকাতায় ভাড়ার ফ্ল্যাটটাও ইন্সপেক্টর সরকারেরই দেখে দেওয়া। ইন্সপেক্টর সরকার শুধু দেখতে পাননি পেছনের সেই গাড়িটাকে। গোয়া থেকে মুম্বই ফেরার রাস্তায় মাইনাস করার জন্য রাস্তায় নামতেই যেটা প্রচণ্ড জোরে পেছন থেকে ধাক্কা মারবে ওনাকে। গাড়ির ড্রাইভার শান্তনুর সঙ্গে গোয়াতেই আলাপ হয়েছিল বিশাখার।

বিশাখার মতো একটা মেয়েকে মাঝরাতে একটা পুলিশ অফিসার জোর করে ধরে এনেছে শুনে রাগে পাগল হয়ে গিয়েছিল শান্তনু। সেই রাগটাই হিংসা হয়ে আছড়ে পড়েছিল সেই রাতেই। শান্তনু নিজেই কি জানত যে ইন্সপেক্টর সরকারকে পুলিশি থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য যেমন ও ছিল, তেমনই ওকে সরানোর জন্য কেনও গ্যাংকে খুঁজে পেয়ে গিয়েছে বিশাখা।

অন্ধকারে খুনের পর খুন করে যাবে, মধুরা কি এমন উন্মাদ? মধুরার নিজেরও তা মনে হয়নি কখনও। মন্টুকে জীবন থেকে না-সরালেও মন্টু একদিন না একদিন কোন গ্যাংস্টারের মরণই। আর লোকাল গুণ্ডার বিধবা বউ হিসাবে কোথায় গিয়ে দাঁড়াত মধুরা? মন্টুকে সরানোর জন্য ফটিককে দরকার হয়ে পড়েছিল ওর। আর ফটিককে না-সরিয়ে মন্টুকে সরিয়ে লাভ কি হত। একটু মুচিনা নেশায় থানার ওসি সাহেবকে পটাতে শুরু করে। বিনিময়ে আদর-ভালোবাসা কিছুই দিতে অসুবিধা ছিল না ওসির। কিন্তু নিজের বউ বাঁজা তাই মধুরাকে বাচ্চা দিতে হবে বলে প্রেগন্যান্ট করার জন্য ক্ষেপে ওঠে।

শান্তনু সে সময়ে একটা দমকা বাতাস হয়ে এসেছিল। ওর সঙ্গে আমেরিকা যাওয়ার পর মধুরা সত্যি আর পেছন ফিরে তাকাতে চায়নি। বিশাখা হয়ে কাটিয়ে দিতে চেয়েছিল বাকি জীবনটা।

শান্তনুর বাচ্চাকাচ্চার কোনও চাহিদা ছিল না। কিন্তু ওর চাহিদা ছিল কোনও কাজ না-করে প্রতি রাতে সিঙ্গল মল্ট। আমেরিকা কাউকে জমিদার হয়ে বাঁচার সুযোগ দেয় না। কিন্তু শান্তনু সেটাই চাইতো বলে নানা পরিকল্পনা করতে হত। দীপ্র যোগাযোগ বন্ধ করে দেওয়ার পর লাস্ট্রিতে টান পড়ায় একেবারে ক্ষেপে ওঠে শান্তনু। সেই বিশখাকে ডোয়াজ করে চলতে ও, তাকে যা না হয় তাই বলতে শুরু করে। দীপ্রর নামে বড় টাকার ইনস্যুরেন্স করে ওকে মেরে ফেলে সেই টাকা হাতানোর পরিকল্পনা জলে জলে যেতে শান্তনুর আর মাথার ঠিক ছিল না। নিজের খেলায় ও নিজেকে শুধু লোভে হিসাবে এগিয়ে দেয়।

নিকারাগুয়া থেকে প্লাস্টিক সার্জারি করে ফিরে আসবে শান্তনু এটাই ঠিক ছিল। আবার ওদের সংসার চলতে থাকবে তরতরিয়ে। কিন্তু এয়ারপোর্ট ইন্ডিয়া ছেড়তে গিয়ে ম্যাজ্জা অনেক অনেক টাকা হেরে মধুরাকে জন্মাগত চাপ দিতে শুরু করে শান্তনু টাকার জন্য। শান্তনু মৃত প্রমাণ করে যে টাকা পেয়েছে, তার একটা ক্যানাকড়িও বাজে খরচ করার ইচ্ছে মধুরার ছিল না। কিন্তু একদিকে শান্তনুর গালাগালি, অন্য দিকে প্যাট্রিকের বাড়তে থাকা আগ্রহ মধুরাকে বাধ্য করে দীপ্রর কাছে যেতে। দীপ্র ফিরে আসার পর একটু দম নিতে পারবে ভেবেছিল ও। কিন্তু দীপ্রও তো সন্দেহ করতে শুরু করল শান্তনু বেঁচে আছে। তাহলে পুলিশের সন্দেহ করতে কত সময় লাগবে? ওদিকে প্লাস্টিক সার্জারি না-করেই আমেরিকায় ফিরে আসার জন্য পাগল হয়ে উঠল শান্তনু। ওর প্রত্যেকটা ফোন মধুরাকে আতঙ্কের সেই কিনারায় ঠেলে দিত, যেখানে প্রত্যেকটা মুহূর্তে ও আমেরিকার সেই জেলখানাগুলো দেখত, যেখানে প্রত্যেকটা সেলে নতুন আসা একটা মেয়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শঙ্কজন করে পুরনো করেদি। তবু শান্তনুর ক্ষেত্রে প্যাট্রিককে যে লাইসেন্স দিয়েছিল দীপ্রর ক্ষেত্রে কখনোই তা দিত না মধুরা। দিতে বাধ্য হল কারণ করে কোথায় মামাবাড়িতে এসে ওকে চিনে ফেলা মেয়েটা দীপ্রকে ফেসবুকের ইনবক্সে সব জানিয়ে দিল। আর মরণি তো মর তার আগেই প্যাট্রিকের নির্বুদ্ধিতায় দীপ্র সন্দেহ করতে শুরু করল ওকে। কারণ, নিজের মায়ের দুর্ব্যবহারে চিরকাল বাচ্চাকাচ্চা থেকে দূরে থাকতে চাওয়া মধুরা যেদিন টের পায় দীপ্রর সন্তান ধারণ করেছে ওর শরীরে সেদিন ওর ভালো লাগতে শুরু করে। এই বাচ্চাটাকে সরিয়ে দিতে হবে পুলিশি থেকে? দীপ্রকেও সরিয়ে দিতে হবে? এই দুটো খুনের একটাও করতে চায়নি সে? কিন্তু আগেরগুলোই কি চেয়েছিল?

৩২

প্যাট্রিকের হাতটা এমনভাবে দীপ্রর নাক আর মুখটা চেপে ধরল যে ওর নিঃশ্বাস নেওয়াই কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। হাতের ভারেই নড়িয়ে দাঁড়িয়েই মরে যেত দীপ্র। কিন্তু, সেই অবস্থাতেই ওর ছোটবেলার কথা মনে পড়ে গেল। হ্যাঁ, ছোটবেলায় ও কথাটা বলে ফেলেছিল। বলে ফেলেছিল বলেই ওকে বাড়ি ছেড়ে হস্টেলে চলে যেতে হয়েছিল। কিন্তু, আজও ওকে কথা বলতে হবে আবার। এভাবে চুপ করে মরে যেতে পারে না ও।

boierpathshala.blogspot.com

PAGE 4,5_0x_PAGE 4,5.qxd 10/6/2017 10:15 PM Page 2

বিশাখাকে মেরে ফেলার আগে প্যাট্রিক নিজেও বুঝি নিস্তেজ হয়ে গিয়েছিল। নইলে পুলিশ ট্রামে উঠে আসার আগেই দীপ্রকে গুলি চালিয়ে মেরে ফেলতে ওর খুব একটা অসুবিধে হত না। আমেরিকার পুলিশ মন্দের জন্য যেমন মন্দ, ভালোর জন্য ঠিক ততটাই ভালো। আমেরিকার আইনও একইরকম। তাই বিশাখা আর দীপ্রর জয়েন্ট ইনস্যুওরেন্সের আফটার ডেথ বেনিফিট সবটাই পেয়ে গেল ও। বড়লোক হয়ে গেল ও এক ঝটকায়।

নিজের সবটুকু শক্তি দিয়ে প্যাট্রিকের হাত থেকে নিজের মুখটা একফালা দিয়ে সরিয়ে দীপ্র ইংরেজিতে চিৎকার করে উঠল— তোমার পেটে তো আমার বাচ্চা। কথাটা ইংরেজিতে বলার মনেই হয়তো প্যাট্রিক চমকে উঠল। বিশাখার দিকে তাকিয়ে বলল, কিন্তু তুমি কথা দিয়েছিলে যে তুমি শুধু আমার বাচ্চাই পেটে ধরবে। শুধু আমার। বিশাখা কেমন একটা ঘোরের মধ্যে থেকে বলে উঠল, ও মিথ্যে বলছে। দীপ্র হেসে উঠল— আমি সত্যি বলছি। দীপ্রর হসিটা শেষ হওয়ার আগেই প্যাট্রিক প্যান্টের পকেট থেকে রিভলবার বের করে চকিতে গুলি চালিয়ে দিল বিশাখার পেটে— একটা, দুটো, তিনটে। গুলির শব্দগুলো আকাশে মিলিয়ে যাওয়ার আগেই পুলিশের গাড়ির শোনা গেল।

৩৩

মানুষ মরে গেলে তো আর কোনও শাস্তি হয় না। তাই বিশাখারও কোনও শাস্তি হল না। বিশাখাকে মেরে ফেলার আগে প্যাট্রিক নিজেও বুঝি নিস্তেজ হয়ে গিয়েছিল। নইলে পুলিশ ট্রামে উঠে আসার আগেই দীপ্রকে গুলি চালিয়ে মেরে ফেলতে ওর খুব একটা অসুবিধে হত না। আমেরিকার পুলিশ মন্দের জন্য যেমন মন্দ, ভালোর জন্য ঠিক ততটাই ভালো। আমেরিকার আইনও একইরকম। তাই বিশাখা আর দীপ্রর জয়েন্ট ইনস্যুওরেন্সের আফটার ডেথ বেনিফিট সবটাই পেয়ে গেল ও। বড়লোক হয়ে গেল ও এক ঝটকায়। কিন্তু ওর অন্ধকার কি কাটল তাতে? নাকি বেড়ে গেল আরও? যখন একটা মাকবয়সি লোকের বউ হিসেবে সুচন্দ্রা নিজের ছবি আপলোড করল ফেসবুকে। একবার সেই ছবিটার দিকে তাকিয়ে নিজের কাছে থাকা বিশাখার ছবিটা দেখে দীপ্র আলো বন্ধ করে দিল ওর ঘরে। আর সেই অন্ধকার ঘরের ভেতরে ওর মাথার ভেতর দপদপ করতে থাকল মৃত পিতৃত্ব, মৃত লম্পটত্ব, মৃত প্রেম। তবে অত অত মৃত্যুর ওপরে একটা নতুন সূর্য তার নতুন আলো অপেক্ষা করছে হয়তো। দীপ্রর বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হল।

(সমাপ্ত)

boierpathshala.blogspot.com